মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং - ২৭২
১৬শ বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
আগষ্ট ২০১১ ঈসায়ী

তাসাউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

“এলো মাহে রমজান সাথে নিয়ে সওগাত রহমত, মাগফিরাত আর নাজাত”

মহিলা জিন্দা-ওলী হযরত সৈয়দা নাফিসা আত-তাহিরার (র)
মাজার শরীফের অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য
[মিশর]

মিশরে হযরত সৈয়দা নাফিসার (র) মাজার কমপ্লেক্স

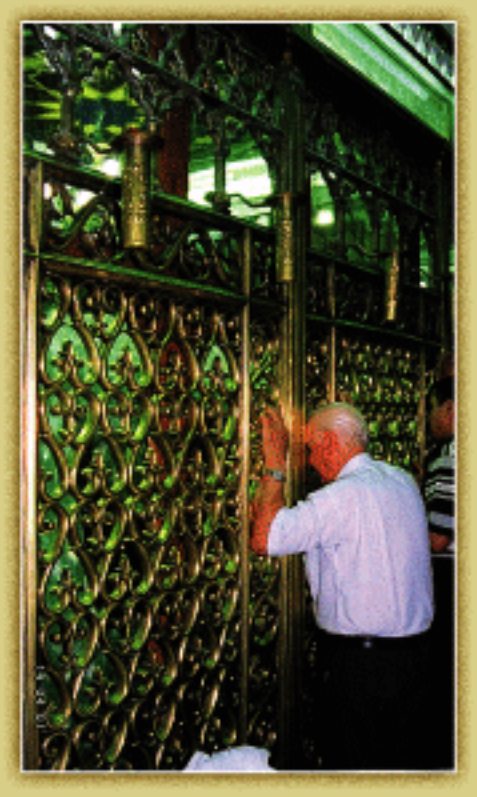

মাজার জিয়ারত করছেন একজন পুরুষ জায়েরীন

মাজার জিয়ারত রত মহিলারা

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
MULTIDISCIPLINARY STUDIES

রেজিঃ নং ২৭২, ১৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
আগস্ট ২০১১ ঈসায়ী
শাবান-রমযান ১৪৩২ হিজরী
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪১৮ বাংলা

◆

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

◆

প্রদায়ক
প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
মোঃ গোলাম রসুল
জসিম উদ্দিন মাহমুদ
দিদারুল আলম চৌধুরী

◆

সম্পাদক
মোঃ মাহবুব উল আলম

◆

প্রচার তত্ত্বাবধায়ক
মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আশরাফ

◆

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনায়
মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দীন

মূল্য : ১৫ টাকা
(US $=2)

কম্পোজ
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৫, সিডিএ, সি/এ (তেতলা) মোমিন রোড,
চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৮৮৫৫
website :
www.sufimaizbhandari. org
e-mail address :
monzurul @ bangla. net.

সূচী

■ সম্পাদকীয় : তাসাউফ ও মাইজভাণ্ডার শরীফ---------------২

■ মহিলা জিন্দা ওলী–হযরত সৈয়দা নাফিসা আত্-তাহিরা (র) [মিশর] ---৩

■ সূফীদের সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন
–ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী----------৭

■ কুরআনের আলো
–মুহাম্মদ রবিউল আলম--------------------৯

■ হাদিসের আলো
–অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী---১৩

■ সূফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা
–অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান--------------১৫

■ রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের শুভবার্তা
–আ ব ম খোরশিদ আলম খান-------------১৭

■ আত্মশুদ্ধির সপ্ত পদ্ধতি
–শরীফ মোহাম্মদ আরীফ-উর-রহমান-----২৯

■ "কিতাব-উল-লোমা" (আলোকিত গ্রন্থ)
মূল–শাইখ আবু নছর সিরাজ আত-তুসী (রহ) ইন্তিকাল-৩৭৮ হিজরী
–আবুল ফজল মোহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী----৩৩

■ ইমাম আব্দুল গনী নাবলুসী (ক)
ভাষান্তর : মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ শওকত খান / সৈয়দ আরিফ মঈনুদ্দিন-----৩৫

■ গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) ও হযরত বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক)-এর অবস্থান : প্রেক্ষিত মাইজভাণ্ডারী তরিকা
–সৈয়দ রায়হান--------------------------৩৭

■ হযরত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বাকির (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)
–কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহীম--------------------৪১

■ নবীদের ইতিহাস --------------------------------৪৪

■ সংগঠন সংবাদ ----------------------------------৪৭

সম্পাদকীয়...

তাসাউফ ও মাইজভাণ্ডার শরীফ

তাসাউফের মূল কথা আল্লাহ্‌র উপলব্ধি। সকল প্রকার কর্ম, ইবাদতের সকল পদ্ধতি ও নিয়ম এবং জাগতিক সকল কিছুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুভূতি লাভ ও তাঁর যাতকে দর্শন করাই সূফী দর্শনের লক্ষ্য। হাদীস শরীফে হযরত নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম নির্দেশ দান করেছেন : "তুমি এমনভাবে ইবাদত কর যেন আল্লাহ্‌কে দেখছ। নতুবা এমনিভাবে তাঁর ইবাদত কর যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।" ইসলামে 'ইবাদত' শব্দের অর্থ ব্যাপক। মানুষের সর্বপ্রকার সৎকর্ম-যা আল্লাহ্‌র স্মরণযুক্ত-সবই ইবাদত। মোটকথা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা মানুষের যা করণীয়, যা জীবনে প্রয়োজন ও কর্তব্য, সবই ইবাদতের অন্তর্গত, যদি তা প্রভু স্মরণযুক্ত হয়, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশের অনুকূলে হয়। কাজেই জীবনের সকল সময় আল্লাহ্‌কে হাযির-নাযির জেনে সর্বপ্রকার কর্ম ও কর্তব্য সম্পাদন করাই ইবাদতের তথা মানব জীবনের প্রকৃষ্ট পন্থা তথা মূল লক্ষ্য। ইবাদতকে সুন্দর ও মাধুর্যময় করতে হলে ইহসানের সাথে তা সম্পাদন করতে হবে। ইসলামের গূঢ় রহস্যই এই 'ইহসান'। ইবাদতের বাতিনী বা অভ্যন্তরীণ দিকই এই ইহসান। ইহসান ও তাসাউফ পরস্পর গভীর ও অভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত। আল্লাহ্‌র উপলব্ধি যেমন তাসাউফের মূলকথা, আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও উপলব্ধি তেমনি ইহসানেরও গূঢ় অর্থ। 'ইহসান' তাই তাসাউফের উৎস বললে অত্যুক্তি হয় না।

তাসাউফের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সে জন্যই হযরত মারুফ আল-কারখী (র) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র যাতের (সত্তার) উপলব্ধিই তাসাউফ।" আল্লাহ্‌র সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে আল্লাহ্ ব্যতীত সব কিছুকেই ফানা (বিনাশ) করা প্রয়োজন। এমনকি আপনাকে পর্যন্ত ফানা করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ সকল প্রবৃত্তিকে বর্জন করে আত্মাকে ও হৃদয়কে কলুষমুক্ত করে, হারাম দ্রব্য ও কর্ম থেকে দূরে থেকে পবিত্র, মনোরম ও সুন্দর আচরণ ও নৈতিক চরিত্র গঠনপূর্বক সদভ্যাস গঠন ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় গড়ে তুলে একমাত্র আল্লাহ্‌কে পাবার আকাঙ্ক্ষা করা সূফী দর্শনের আসল মর্ম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সূফী দরবেশ ও চিন্তাবিদগণ তাসাউফের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। হযরত যুননুন মিসরী (র)-এর মতে, "আল্লাহ্ ব্যতীত সকল কিছু পরিত্যাগ করাই তাসাউফ।" হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র) বলেন, "জীবন ও মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতাই তাসাউফ।" আপনার অহং বোধকে যতক্ষণ জীবিত রাখা যাবে, ততক্ষণ পরম যাত পাককে উপলব্ধি করা যাবে না। অহং প্রবৃত্তিকে হত্যা করেই (ফানা করে) তাঁকে পাওয়া সম্ভব। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে, দুঃখে-বিষাদে, সুখে-শান্তিতে একমাত্র তাঁরই সাহায্য ও রহমত আকাঙ্ক্ষা করা ও তাঁকেও ভালবাসার নাম তাসাউফ। সেজন্য হযরত আবু আব্দুল্লাহ খাফিফ (র) বলেন, "খোদা যাঁকে তাঁর প্রেম দ্বারা পরিশুদ্ধ করেছেন, তিনিই প্রকৃত সূফী।" হযরত ইমাম গাযযালী (র) তাসাউফের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা অত্যন্ত সুন্দর ও যথার্থ। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত অপর সবকিছু থেকে হৃদয়কে পবিত্র করে সতত আল্লাহ্‌র এবাদতে নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌তে নিমগ্ন হওয়ার অপর নামই তাসাউফ।" এখানে হযরত ইমাম গাযযালী (র) ইসলামের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করে ইসলামের তথা জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'দিকের প্রতিই সমান গুরুত্ব আরোপ করে নৈতিকতাবোধ ও তওহীদ প্রতিষ্ঠায় গ্লানি, আবর্জনা, কালিমা ও সিরাতুল মুস্তাকীমের অন্তরায় সমূহকে পরহেয (পরিত্যাগ) করার দিকে ইঙ্গিত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত আল-কুশাইরী (র) বলেন, "জীবনের যাহিরী ও বাতিনী বিশুদ্ধতাই তাসাউফ।" এখানে জীবনের নৈতিকতা ও অভ্যন্তরীণ 'ইহসান' বা সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবুল হুসাইন নূরী (র)-ও এমনিভাবেই বলেন, "ইন্দ্রিয়জ আত্মার সব প্রযুক্তির বিসর্জনই সূফী দর্শনের মূল।" একই সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় হযরত আবু মুহাম্মদ আয-যারিনীর ভাষায়। তিনি বলেন, "সচ্চরিত্র গঠন ও সমস্ত অনিষ্টকর কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকাই তাসাউফ।" কিংবা হযরত আবু সাহল সালুকীর ভাষায়, "সকল আপত্তিকর বিষয় থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখাই অপর নাম তাসাউফ।" এদিকে হযরত আবু আলী কাজিনী 'মনোরম আচরণ'- কেই সূফীতত্ত্ব বলে অভিহিত করেন। তাসাউফের সংজ্ঞা নির্দেশে শায়খুল ইসলাম হযরত যাকারিয়া আল-আনসারী (র)-এর অভিজ্ঞতা বাস্তব ভিত্তিক ও অনেকাংশে যুক্তিপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, "সূফী দর্শন আত্মার সংশোধনের শিক্ষা দান করে, তার নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার (বিলায়েত) অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনের যাহিরী ও বাতিনী দিককে গড়ে তোলে। আত্মার পবিত্রতা বিধানই এর বিষয়বস্তু এবং এর লক্ষ্য চিরন্তন শান্তি।" আবার আলী আর-রুদ্‌বারী বলেন, "পার্থিব জগতকে দূরে নিক্ষেপ করে আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় পূর্ণাঙ্গ মানবের (রসূলুল্লাহ্) পথ অনুসরণ করাই সূফীতত্ত্বের মূল।" অন্যত্র হযরত বায়েজিদ বুস্তামী (র) বলেছেন, "আরাম আয়েশ ত্যাগ করা এবং আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুঃখ-কষ্টকে বরণ করাই প্রকৃত তাসাউফ।"

উপরে তাসাউফের যেসব সংজ্ঞার সাথে আমরা পরিচিত হলাম তার সবগুলোরই অনুসরণের তাগিদ রয়েছে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায়। তাসাউফের স্তরে উন্নীত হবার জন্য যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, তা হচ্ছে মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকায় নির্দেশিত উসূলে সাবওয়া বা সপ্তপদ্ধতি এবং মাউতে আরবাআ বা চতুর্বিধ মৃত্যু। এই পথ অনুসরণ করেই তাসাউফের মনজিলে প্রবেশ সম্ভব।

মহিলা জিন্দা ওলী

হযরত সৈয়দা নাফিসা আত্-তাহিরা (র) [মিশর]

১. পরিচিতি :

পবিত্র নবী-বংশের মর্যাদাময়ী বিদূষী উত্তরাধিকারী সৈয়দা নাফিসা (র)। তিনি ইল্‌মের আলো, নাফিসাত আল-ইল্‌মি ওয়াল-মারিফাত বা (The Rare Lady of Knowledge and Gnosis), নাফিসাত আল্-তহিরা (The Rare Lady of Purity), নাফিসাত আল-আবিদা (The Rare Worshipful Lady), নাফিসাত-আল-দারায়েন (Rare one among Ladies in this life and the next), সাহিবাত-আল-কারামাত (The Lady of Miracles), সাইয়েদা আহ্‌ল আল-ফতোয়া (The Leading Lady in deriving rulings and verdicts), উম্মুল আওয়াজ্জিজ (The Mother of Elderly Women), নাফিসাত আল-মাশ্‌রিক্বিন (The Rare Lady of the Egyptians) প্রভৃতি মর্যাদাপূর্ণ লকব বা উপাধিতে বিভূষিতা। মহিয়সী এই বিদূষী মানবীকে জ্ঞানার্ণব, মহিমার্নব রূপে অভিহিত করে বিদ্বান-জগৎ তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্য হতে চেয়েছে।

২. পবিত্র বংশধারা :

সৈয়দা নাফিসার (র) পিতার নাম সৈয়দ হাসান আল-আনওয়ার (র), যাঁর পিতা যায়েদ আল-আবলায (র), যাঁর পিতা হযরত ইমাম হাসান (র), যাঁর পিতা চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (ক) আর মাতা নবী-নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা)।

তাঁর স্বামীর নাম সৈয়দ ইসহাক (১৬১ হিজরী সনে ১৬ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়) আল-মোমেন বা আল-মোতামান; যাঁর পিতা হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র)। তাঁর ভাইয়ের নাম সৈয়দ ইয়াহিয়া আল-মোতাওয়াজ, যিনি কায়রোর সৈয়দা জয়নাবের (বিনতে ইয়াহিয়া) পিতা। তাঁর ফুফুর নাম সৈয়দা নাফিসা আল কুবরা। সৈয়দা নাফিসা (র) আল-কাসিম (র) নামে একপুত্র ও উম্মে কুলসুম নামে এক কন্যা সন্তান ছিলেন।

৩. জন্ম ও শিক্ষা :

সৈয়দা নাফিসা ১৪৫ হিজরীর ১১ রবিউল আউয়াল মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যা সন্তান পেয়ে পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং নবজাতিকাকে নিয়ে নবীজীর (দ) রওজা মোবারকে হাজিরা দেন। পিতা তাঁর স্নেহময়ী কন্যাকে অতি যত্নে লালন-পালন করতে থাকেন। কন্যা যাতে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠে, সে লক্ষ্যে পিতা প্রত্যেক ধর্মীয় ক্লাস, মোয়ালিদ মাহফিল, জিকির ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। পিতা সৈয়দ হাসান আল-আনওয়ার যখন মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হন, তখন কন্যা সৈয়দা নাফিসাকে সাথে করে মসজিদ, নবীজীর (দ) রওজা মোবারক ও দীওয়ান বা প্রশাসনিক সভাকক্ষে নিয়ে যেতেন।

কথিত আছে, এক রাতে নবীজী (দ) স্বপ্নে সৈয়দ হাসান আল-আনওয়ারকে বলেন, "ওহে, হাসান! তোমার কন্যা নাফিসার উপর আমি সন্তুষ্ট ও সুখী আছি। অতএব, আল্লাহ্‌ও তার উপর সন্তুষ্ট।"

মাত্র আট বছর বয়সে সৈয়দা নাফিসা পবিত্র কোরআন এবং নবীজীর (দ) হাদীস ও সুন্নাহর বিপুল অংশ শিক্ষা করেন। এর ফলে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুধাবনে সক্ষম হয়ে উঠেন। তাঁর বিপুল ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার তাঁকে একটি জ্ঞানাগার তথা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে সমবেত হতেন অগণিত জ্ঞান পিপাসু ও আইন সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ।

তাঁর স্বামী কখনো তাঁকে ধর্মীয় ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেননি। তিনি ইমাম মালেকের (র) ক্লাসেও (হাওযা) যাবার ব্যাপারে অটল ছিলেন। স্বামী তাঁকে ঘুরে ঘুরে মহিলা ও বালিকাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাসহ লেখা-পড়া শেখাতে উৎসাহ দিতেন। সৈয়দা নাফিসা (র) ত্রিশবার পবিত্র হজ্জব্রত সমাপন করেন এবং অধিকাংশবারই পদব্রজে।

৪. সৈয়দা নাফিসার (র) মিশর আগমন :

বিদূষী মহিলা হিসেবে তাঁর নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে

পড়ার পর সর্বত্র তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। হজ্বব্রত পালনের সময়ে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য হজ্বযাত্রীদের মধ্যে এক পবিত্র ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হতো। তাঁর জ্ঞানের বিভায় মুগ্ধ মিশরবাসীরা তাঁকে মিশর যাবার এবং সেখানে তাঁদের সাথে অবস্থান করার আমন্ত্রণ জানান। তিনি একদা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি ফিলিস্তিনের হেবরনে পিতৃপুরুষদের গুহায় (Cave of The Patriarchs) হযরত ইব্রাহিমের (আ) মাজার জিয়ারত করছেন। তাঁর এ স্বপ্ন শীঘ্র সত্যে পরিণত হলো। স্বামী তাঁর সাথে হেবরনে এলেন এবং সেখান থেকে ১৯৩ হিজরী সনে মিশর গেলেন। ১৯৩ হিজরী সনের ২৬ রমজান ৪৮ বছর বয়সে তিনি মিশর গমন করেন। তাঁর আগমন সংবাদে মিশরের হাজার নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর-জনতা সুসজ্জিত রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। আল-আরিশ থেকে সিনাই হয়ে কায়রো পর্যন্ত রাস্তায় তাঁকে এভাবে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হলো। মিশরের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন আবদুল্লাহ আল-গাসাসাস কায়রো নগরীর প্রাণ কেন্দ্রে তাঁকে বসবাসের জন্য একটি মনোরম গৃহ উপহার হিসেবে অর্পণ করলেন। নবীজীর (দ) উত্তরাধিকারী সৈয়দা নাফিসা (র) এবং সৈয়দ ইসহাকের (র) মাধ্যমে তিনি এ গৃহ নবীজীর খেদমতে পেশ করার এরাদা পোষণ করেছিলেন।

সারা মাস ধরে মিশরের প্রত্যেক এলাকা থেকে হাজার হাজার মিশরীয় তাঁর শিক্ষা গ্রহণ ও চমৎকার বক্তৃতা শোনার জন্যে তাঁর কাছে এলেন। অতঃপর সৈয়দা নাফিসা (র) তদীয় স্বামীসহকারে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও গুণমুগ্ধ মিশরবাসী তাঁকে ঘিরে ধরলেন। তাঁকে বিদায় দিতে নয়, তাঁকে মিশরে রেখে যাবার জন্য হযরত সৈয়দ মোতামানের (র) কাছে ব্যাকুল আর্জি জানাতে থাকেন। মিশরীয়রা এ ব্যাপারে তৎকালীন গভর্নর আস-সিররি বিন আল হাকামের শরণাপন্ন হন। জনগণের ঢল দেখে তিনি নিজে সৈয়দ নাফিসা (র) সকাশে এসে তাঁকে মিশরে অবস্থানের আবেদন জানান। জনগণের অনেক জোরাজুরি ও অনুনয়-বিনয়ের পর সৈয়দ মোতামান (র) তাঁকে মিশরে রেখে যেতে রাজী হলেন এবং স্বীয় ভাইঝি জয়নাব বিনতে ইয়াহিয়াকে তাঁর খেদমতে রেখে গেলেন। জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণের জন্যে এমন আনসারী-মুহাজেরীর ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। সৈয়দা নাফিসার (র) এই জীবন বৃত্তান্তে ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞান সাধনায় নারীর দিশারী ভূমিকা এবং সে ভূমিকা পালনে পিতৃ পরিবার ও স্বামীর পরিবার থেকে অকুণ্ঠ সর্বাত্মক সহযোগিতার এক অনুপম অনুকরণীয় চিত্র ফুটে উঠে।

৫. জ্ঞানের জগতে কীর্তিময়ী মহিলা ওলী আল্লাহ্ সৈয়দা নাফিসা (র)

বিশ্ব বিশ্রুত মহিয়সী মহিলা, শুদ্ধাচারী জীবনের ভুবনের অনির্বান জ্যোতিষ্ক, মানব-সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরব তাপসী হযরত রাবেয়া বসরীর (র) পবিত্র নাম বাংলাদেশের জনসমাজ তথা সমগ্র বিশ্ব সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত। তাঁর নাম সকল ঘরে ঘরে পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হয়। তাপসী রাবেয়ার (র) জন্ম ৯৫ হিজরী সনে, মতান্তরে ৯৭/৯৯ হিজরী সনে। তিনি ওফাতপ্রাপ্ত হন হিজরী ১৩৫/১৮৫ সনে (ঈসায়ী ৭৫২/৮০১ সনে)। এই মহিয়সী মানবীর ওফাতের দশ বছর পর অথবা জীবদ্দশায় ১৫০ হিজরী সনের ১১ রবিউল আউয়াল পবিত্র মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দা নাফিসা (র)। নবীজীর (দ) জন্মবারই তাঁর জন্মবার।

সৈয়দা নাফিসার (র) জীবন-সাধনা তাপসী রাবেয়ার (র) মতোই কঠিন এবং পূত-পবিত্র। জ্ঞানের জগৎ, ধ্যানের জগৎ, মারেফাতের জগৎ, দরবেশীর জগৎ, সূফী-দর্শনের জগতে তিনি তাপসী রাবেয়ার সফল উত্তর সূরীর আসনে সমাসীনা। তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, এবাদত-বন্দেগী, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ইতিহাস জাহেরী বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। তাপসী রাবেয়ার (র) মতোই তিনি পরম কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন-যাপন করে গেছেন। তবে তাপসী রাবেয়ার (র) সাথে তাঁর সামান্য তফাত এই যে, তাপসী রাবেয়া (র) সংসারধর্ম পালন করেন নি, কেবল আল্লাহ্র নূরের সমুদ্রে অবগাহন করতেন। কিন্তু সৈয়দা নাফিসা (র) যুগপৎ সংসার ধর্ম পালন ও মারিফাতের পথে মুসাফেরী করে নবীজীর (দ) পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। তাপসী রাবেয়ার (র) জ্ঞান ও মারেফাতের উপলব্ধি সুধা পান করার জন্য প্রখ্যাত তাপস প্রবর হযরত হাসান বসরীসহ (র) সমকালীন প্রখ্যাত বুজুর্গ, দার্শনিক, জ্ঞানী ও সাধক ব্যক্তিবর্গ প্রায়শঃ তাঁর কুটির দ্বারে হাজির হতেন। তেমনিভাবে হযরত নাফিসা আত্-তাহিরার কাছে ছুটে এসেছেন মুসলিম ফিকাহ্ বা ব্যবহার শাস্ত্র বা জুরিসপ্রুডেন্সের অন্যতম শীর্ষ স্থানীয় দিকপাল ইমাম শাফেয়ী (র), মহান সূফী ও বিদ্বান আল্-ইমাম উসমান বিন

সায়ীদ আল-মিশরী (র), হযরত জুন্নুন মিশরী (র), হযরত মাসরী আল-সমরকন্দী (র), 'আল-ইসতিফতাহ ফি উলুম-উল কুরআন' নামক অন্যতম বিশ্ব-সমাদৃত তফসীর প্রণেতা হযরত ইমাম আবু বকর আল-যারকাউবী (র), কোরআনের ব্যাকরণ বিষয়ক দশ খন্ডের সুবিশাল উচ্চমার্গীয় গ্রন্থ প্রণেতা হযরত আবুল হাসান বিন আলী বিন ইব্রাহিম (র)-এর মতো মর্যাদাবান ও সর্বস্বীকৃত জ্ঞানী-সূফীসমেত অগণিত জ্ঞান পিপাসু। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে ব্যবহার শাস্ত্র, হাদীস শরীফ এবং কোরআনের বিশ্লেষণ জেনে নিতেন। তাঁর জমানার তাসাউফের স্তম্ভস্বরূপ মহান জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এবং আকতাব-উল-তাসাউফ হিসেবে স্বীকৃত সূফী সাধকরাও তাঁর অধ্যাপনার মজলিশে সমবেত হয়ে জ্ঞান-আহরণ করে ধন্য ও সমৃদ্ধ হতেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) মিশরে আসার পর সৈয়দা নাফিসার (র) সাথে কোরআনের তফসীর, হাদিসের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্ত জেনে নিতেন। এটা ব্যবহারশাস্ত্র অর্থাৎ ফিকাহ, আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের মনীষার উচ্চস্তর ও মর্যাদার নির্দেশক। শুধু তাই নয়, ইমাম শাফেয়ী (র) বিভিন্ন সময়ে সৈয়দা নাফিসার (র) দোয়া ও বরকত যাঞ্ছা করেছেন স্বীয় জ্ঞান ও রূহানী তরক্কির জন্য এবং তিনি তা লাভ করে ধন্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইমাম শাফেয়ী (র) রমজান মাসে সৈয়দা নাফিসার (র) মসজিদে তারাবীর নামাজে ইমামতী করতেন এবং সৈয়দা নাফিসা (র) তাঁরই ইমামতিতে পুরো রমজান মাস তারাবীর নামাজ আদায় করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (র) প্রত্যেক বার অসুস্থতার সময় সৈয়দা নাফিসার (র) দোয়া চাইতেন। নিজে যেতে না পারলে তাঁর কোন ছাত্রকে পাঠাতেন। সৈয়দা নাফিসা (র) হাত তুলে তাঁকে দোয়া করতেন এবং তিনি সুস্থতা লাভ করতেন। অবশেষে আবার একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ইমাম শাফেয়ী (র) তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে দূত পাঠালেন। এবার কিন্তু সৈয়দা নাফিসা (র) বললেন, "তাঁকে বলুন!, আল্লাহ্‌র সাথে ইমাম শাফেয়ীর (র) সাক্ষাৎ যেন শ্রেষ্ঠ সাক্ষাতে পরিণত হয় এবং আল্লাহ্ যেন তাঁকে স্বীয় একান্ত সান্নিধ্যে উঠিয়ে নেন।" দূত এই বার্তা নিয়ে ফিরে এলে ইমাম শাফেয়ী (র) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর ইন্তেকাল আসন্ন। তিনি কালবিলম্ব না করে এই মর্মে অছিয়তনামা লিখলেন যে, 'হযরত সৈয়দা নাফিসা (র) তাঁর জানাজার নামাজ পড়াবেন।' সৈয়দা নাফিসা (র) তাঁর এ ইচ্ছা পূরণ করলেন। বিরতিহীন এবাদত-বন্দেগীর কারণে সৈয়দা নাফিসা (র) নিজে যেতে না পারায় ইমাম শাফেয়ীর কফিন আল-ফুস্তাত জিলা থেকে তাঁর বাড়ীতে (সৈয়দা নাফিসা) আনয়ন করা হয়। ইমাম আল বুওয়াইতি জানাজার নামাজ পড়ান এবং সৈয়দা নাফিসা (র) মহিলাদের তরফে জানাজার নামাজ পড়ান।

সৈয়দা নাফিসার কৃচ্ছ্রতা

সৈয়দা নাফিসা (র) জীবনে অকল্পনীয় কৃচ্ছ্রতা সাধন করে গেছেন। তাঁর ভাইঝি জয়নাব বলেন, "আমার ফুফু প্রতি তিন দিনে একবার মাত্র আহার্য গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত খাদ্য এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোহফা হিসেবে প্রাপ্ত খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করেন নি। একবার মিশরের গভর্নর তাঁকে এক লক্ষ দিরহাম উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি পুরো অর্থই গরীবদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা তাঁর কাছে যে নজরানা পাঠাতেন, তা তিনি নিতেন; তবে তার সবটুকুই তিনি দুর্গতদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। ভাইঝি জয়নাবের বরাত দিয়ে ঐতিহাসিকরা আরো লিখেছেন, "৪০ বছর আমি আমার ফুফুর খেদমতে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে আমি রাতে কখনো ঘুমুতে এবং রোজা রাখার জন্য নিষিদ্ধ চারটা দিন ব্যতীত দিবাভাগে কিছু খেতে দেখিনি।"

ইন্তিকাল :

সৈয়দা নাফিসা (র) তাঁর মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে নিজের ঘরের ভেতরে নিজের হাতে নিজের কবর খনন করেন। প্রতিদিন কবরে নামতেন এবং নামাজ পড়তেন। আল্লামা আল-আজহুরী বলেন, "তিনি স্বীয় কবরে বসে ছয় হাজারবার কোরআন খতম করেছেন এবং এর সাওয়াব সকল মৃত মুসলমানের উপর বকশিশ করেন।

সৈয়দা নাফিসা (র) নিজের শারীরিক অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে মদীনায় অবস্থানরত তাঁর স্বামী হযরত ইসহাক আল-মুতামামকে (র) মিশরে আসার জন্য চিঠি লিখেন। পুত্র কাসেম ও কন্যা উম্মে কুলসুমকে নিয়ে স্বামী মিশরে আসেন। ২০৮ হিজরীর রমজানে তাঁর অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে। তাঁকে 'সিয়াম থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানানো হলে তিনি বলেন, "আমি ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছি, রোজা রাখা অবস্থায় যেন আমার মৃত্যু হয়। আর তোমরা আমাকে রোজা খুলতে বলছো!"

তাঁর ইন্তিকালের পর পবিত্র লাশ মদীনা মনোয়ারায় জান্নাতুল বাকীতে দাফন করতে নেবার প্রস্তুতি নিতে থাকেন তাঁর স্বামী। কিন্তু মিশরবাসী অনুরোধ জানান, তাঁর নিজ হাতে খনন করা কবরেই তাঁকে দাফন করতে। মিশরের গভর্নরও একই অনুরোধ জানান। তাঁরা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে তাঁকে নজরানা প্রদান করেন।

ঐ রাত অবসানের পর হযরত ইসহাক আল-মুতামান মিশরবাসীকে জানান, "গত রাত নবীজী (দ) আমাকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন; 'তাদের অর্থ তাদেরকে ফিরিয়ে দিন এবং আপনার পত্নীকে মিশরে দাফন করুন।' অতঃপর সৈয়দা নাফিসাকে (র) মিশরে দাফন করা হয় এবং তাঁর নামেই এই জিলার নাম পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এই জিলা এখনো 'সৈয়দা নাফিসা' নামে অভিহিত।

প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর ওরশ শরীফ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র মিশর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে লাখো লাখো ভক্ত এতে শরীক হন।

কারামত :

সৈয়দা নাফিসা (র) একজন উচ্চ মার্গীয় কারামত বিশিষ্ট বুজুর্গ ওলী আল্লাহ্ ছিলেন। ইমাম ইবনে হাজর আল-আসকালানী (র) এই মহিলা ওলী আল্লাহ্র দেড় শতাধিক কারামত লিপিবদ্ধ করেন।

(১) পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী সুস্থ হয়ে গেল : সৈয়দা নাফিসা (র) মিশরে বসবাস শুরু করার সময় তাঁর পড়শী ছিলেন একটা অমুসলিম পরিবার। তাঁদের এক মেয়ের কোমড় থেকে নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা অবশ ছিল। একদিন মেয়েটির মা বাজার করতে যাবার সময় তাকে সৈয়দার ঘরের এক কোণায় রেখে গেলেন। সৈয়দা নাফিসা (র) অজু করার সময় অজুর পানি মেয়েটার দিকে প্রবাহিত হয়। এ পানি মেয়েটার শরীরের পঙ্গু অংশে লাগার সাথে সাথে তা সজীব হয়ে উঠতে শুরু করে। সে ঐ পানি তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত অংশে লাগাতে থাকে এবং আল্লাহ্র রহমতে এক পর্যায়ে সে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। সৈয়দা নাফিসা (র) ছিলেন নামাজে মগ্ন। মেয়েটার মা বাজার থেকে ফিরে এলেন। মেয়ে হেঁটে গিয়ে মাকে সব খুলে বললো। আনন্দে উল্লসিত মা এই বিচিত্র দৃশ্যে অবাক হলেন এবং সপরিবারে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

(২) নীল নদে পানি এলো : ২০১ হিজরী সনে (৮১৬ খৃস্টাব্দ) মিশরের নীল নদে বন্যা হলো না। হাহাকার শুরু হলো। লোকেরা সৈয়দা নাফিসার (র) কাছে এসে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতে অনুরোধ করলো। পানি না হলে ফসল হবে না। সৈয়দা নাফিসা (র) তাঁদেরকে তাঁর বোরকাটা দিয়ে বললেন; "এটা নদীতে ফেলে দিন। আল্লাহ্র রহমতে নদীতে বান ডাকবে।" লোকেরা তা করলো। নীল নদে বান এলো।

(৩) ইন্তিকাল পরবর্তী কারামত : সৈয়দা নাফিসার (র) ইন্তিকাল পরবর্তী কারামতের সংখ্যাও অসংখ্য।

(ক) ৬৩০ হিজরীতে এক চোর তাঁর মাজার সংলগ্ন মসজিদে প্রবেশ করে ছয়টি রূপার আলোকদানী হাতিয়ে নিয়ে বের হতে চাইলে কোথাও কোন দরোজা খুঁজে পায়নি। ফজর পর্যন্ত সে এ অবস্থায় রইলো এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো।

(খ) ১৯৪০ খৃস্টাব্দেও একই ধরনের এক ঘটনা ঘটে। ঐ এলাকায় জানা-শোনা এক ব্যক্তি রাতে সৈয়দা নাফিসা (র) মসজিদে প্রবেশ করে। সবাই চলে যাবার পর সে মসজিদের একটি সুন্দর কাশ্মীরি শাল নিয়ে সটকে পড়তে চায়। কিন্তু দরোজা খুঁজে না পাওয়ায় বের হতে পারেনি। সকালে লোকজন এলে সে ধরা পড়ে এবং তাকে পুলিশের হাওলা করে দেওয়া হয়।

(গ) ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, "আবদুল ইজ্জ আল-ইয়ামানী বলেছেন, "আমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত ও ধনী ছিলাম। এতে আমার অহংকার ও একগুঁয়েমী ছিল। একদা আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। চিকিৎসার খরচ যোগাতে বলতে গেলে আমার সব অর্থই খরচ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি হযরত সৈয়দা নাফিসার (র) শরণাপন্ন হলাম। আশাহত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক সময়ে স্বপ্নে দেখলাম, সৈয়দা নাফিসা (র) মেহেরবানী করে আমার কাছে এলেন এবং আমার চোখে কিছু মুছে দিলেন। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি দেখলাম, আমার পুরো দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

এ ধরণের অনেক কারামত রয়েছে হযরত সৈয়দা নাফিসার (র)। তিনি একজন জিন্দা ওলী। তাঁর প্রতি আমাদের অগণিত সালাম। আমরা তাঁর দোয়া প্রার্থী।

[হযরত ইমাম মোতাওয়াল্লী আশ্-শরয়ী (র) প্রণীত "আহ্ল-আল বয়েতের আলোয় আমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উন্মোচন"-গ্রন্থ থেকে 'দি মুসলিম ম্যাগাজিন'-এ উৎকলিত নিবন্ধ অনুসরণে বাংলায় অনুবাদ, সংক্ষেপন ও সম্পাদনায় মোঃ মাহবুব উল আলম।]

সূফীদের সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

• ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী •

সূফীদের অন্যতম সমালোচক বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ইউসুফ হেজাজী মত প্রকাশ করেন যে, সূফীবাদীরা হচ্ছে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোত্র। এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। মহান সূফীদের অন্যতম হচ্ছেন শেখ আহমদ শেরহিন্দী (র) যাকে ইমামে রব্বানী বলা হয়। হযরত শেরহিন্দী (র) বলেন, "শরীয়তের তিনটি অংশ আছে। এ তিনটি অংশ হল যথাক্রমে (১) জ্ঞান, (৩) কাজ এবং (৩) আন্তরিকতা। সূফীবাদের ভূমিকা হল তৃতীয় অংশ অর্থাৎ আন্তরিকতার বিকাশ সাধন করা। যে সকল মুসলিম আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালায় অর্থাৎ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিকাশ সাধনের জন্য কাজ করে তাদেরকে কি একটি আলাদা ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে অভিহিত করা ঠিক হবে? কখনই না। সূফীবাদের প্রতি বেশীর ভাগ মুসলমানের একটি আবেগতাড়িত সম্পর্ক (emotional attachment) রয়েছে যা খুবই শক্তিশালী। একে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার কোন সুযোগ নেই।"

সূফীবাদ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। কারো কারো মতে, আরবী 'সূফ' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে। 'সূফ' অর্থ 'সূফ' পশমের চাদর পরিহিত ব্যক্তি। মসজিদে নববীতে অবস্থানকারী আসহাবগণ পশমের চাদর পরিধান করতেন বলে তাঁদেরকে সূফী বলা হোত। আবার কারো কারো মতে, আরবী 'সাফা' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে। 'সাফা'র অর্থ হল শান্তি বা চিন্তা থেকে মুক্তি। যে সকল খোদা-প্রেমিক পার্থিব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে খোদার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে সুখ বা শান্তি অনুভব করেন, তাঁরাই হলেন সূফী। অন্য এক মত অনুসারে, 'সাফি' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে যার অর্থ হল পরিশুদ্ধ আত্মা। যাঁদের আত্মা পরিশুদ্ধ এবং যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া কিছুর অস্তিত্ব নেই, তাঁরাই হচ্ছেন সূফী। আর এক মতে, 'সাফা' শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দটি এসেছে যার অর্থ হল নিকটতম। যাঁরা আল্লাহ্র খুবই নিকটতম এবং যাঁরা হাশরের দিন প্রথম সারিতে আল্লাহ্র সামনে বসবেন তাঁরাই হচ্ছেন সূফী। (ছির্-আল-আছরার (Secret of The Secrets) by হযরত শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (র)। শায়খ তসুন বায়রাক কর্তৃক অনূদিত।)

প্রাথমিক যুগে কোন কোন সূফীরা হযরত ঈসা (আ)'র অনুসরণে পশমী কাপড় পরিধান করতেন বলে মত প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এ মত সার্বজনীন নয়। সম্ভবতঃ পশমী কাপড় সাদাসিদে এবং অনাড়ম্বরপূর্ণ হওয়ায় সূফীরা তা পরিধান করতেন বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। ইবনে তাইমিয়ার মতে, মহানবী (দ) আমাদের কাছে অত্যধিক প্রিয়। মহানবী (দ) বেশীরভাগ সময়ে সুতোর (Cotton) কাপড় পরিধান করতেন বিধায় আমাদেরকে তা অনুসরণ করা উচিৎ।" ইবনে তাইমিয়া কতেক সূফীদের কাজকর্ম ও কথাবার্তাকে সমালোচনা করেছেন; আবার কোন কোন সূফীর কাজকর্ম ও বক্তব্যের প্রশংসাও করেছেন। যে সকল সূফীদের কাজকর্ম ও বক্তব্যকে তিনি প্রশংসা করেছেন তাঁদের মধ্যে কাদেরীয়া ত্বরীকার প্রবর্তক শেখ সৈয়দ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (র) অন্যতম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শেখ আহমদ শেরহিন্দি (র)'র মতে সূফীবাদ হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি আন্তরিকতাকে (ইখলাছ) পরিপূর্ণতা দানের বিজ্ঞান। সূফীবাদের সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, সূফীবাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের ধারণার সংমিশ্রণ রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম থেকে সূফীবাদী দর্শন ধার করেছে। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রা)'র বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "যে শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে তাসাউফ চর্চা করে তার ঈমান বা বিশ্বাস কলুষিত বা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং যে তাসাউফ চর্চা না করে শরীয়ত অধ্যয়ন করে সে নিজেই কলুষিত। ঐ ব্যক্তিই সত্যের পথে রয়েছে যে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।" (Islamic Beliefs and Doctrine According to Ahl Al-Sunnah by Shaykh Hisham Kabbani, P. 278; মুহাদ্দিস আহমদ জাররূখ, হাফিজ আলী ক্বারী আল হারাবী, মুহাদ্দিস আলী বিন আহমদ আল আদাবী এবং ইবনে অজিবা প্রমুখের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

অনেকে সূফীদের জিকির পদ্ধতিরও সমালোচনা করে থাকেন। তারা বলেন, সম্মিলিতভাবে বসে বা দাঁড়িয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' রবে জিকির করার কোন ইসলামী ভিত্তি নেই। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। সম্মিলিতভাবে কিংবা দলবদ্ধভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' রবে জিকির করা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মহানবী (দ) কে বলতে শুনেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জিকির। (তিরমিজি)। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা হযরত মুয়াবিয়া মসজিদ পরিদর্শনে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন যে, কয়েকজন সূফী বৃত্তাকারে (হালকা জিকির) বসে জিকির করছেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি করছেন?" তাঁরা উত্তর দিলেন, "আমরা আল্লাহ্‌র জিকির করছি।" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ সাক্ষী! আপনারা কি আল্লাহ্‌র স্মরণ ছাড়া আর কিছু করছেন না?" তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ! আল্লাহ্‌র স্মরণ ছাড়া আমরা আর কিছু করতে বসিনি।" তখন হযরত মুয়াবিয়া বললেন, "আপনাদেরকে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে শপথ করতে বলিনি।" অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া বর্ণনা করেন, "একদা মহানবী (দ) তাঁর সাহাবাদের একটি মজলিস পরিদর্শন করলেন এবং জানতে চাইলেন "আপনারা এখানে কেন সমবেত হয়েছেন?" তাঁরা উত্তর দিলেন, "আমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য এবং আল্লাহ্ যাতে আমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করেন এবং তাঁর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন তজ্জন্য তাঁর প্রশংসা করার জন্য সমবেত হয়েছি।" মহানবী (দ) তখন বললেন, "আপনারা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলুন, আপনারা যা বলছেন তা সত্যি? সাহাবারা বললেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা যা বলছি তা সত্যি।" তখন মহানবী (দ) বললেন, "আমি আপনাদেরকে কোন সন্দেহবশে আল্লাহ্‌র শপথ করতে বলিনি। হযরত জিবরিল (আ) আমার সাথে দেখা করেছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাদের সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের কাছে গর্ব অনুভব করেছেন।"

(মুসলিম)। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে, কিংবা শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।" (৩: ১৯০-৯১)। "যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অন্তরে সুখ পাও, তবে তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে।" (১৩: ২৭-২৮)। বলা বাহুল্য, সূফীরা তাই জিকিরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

কেউ কেউ মত প্রকাশ করে থাকেন যে, সূফীরা জেহাদের বিরোধী। কথাটা আদৌ সত্যি নয়। সূফীরা জেহাদের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। চেচনিয়ার ইসলামী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শেখ শামিল যিনি একজন নক্সবন্দী ত্বরীকার সূফী সাধক। বিগত শতাব্দীতে চীনের মুসলিম স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন মা'হুয়ালং। মা'হুয়ালং হচ্ছেন একজন নক্সবন্দী ত্বরীকার প্রখ্যাত সূফী সাধক। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতা শেখ মুহাম্মদ জাহেদ কট্‌কু হলেন একজন নক্সবন্দী ত্বরীকার সূফী সাধক। ভারতবর্ষে সম্রাট আকবরের শাসনামলের পর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় যিনি অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন নক্সবন্দী ত্বরীকার প্রখ্যাত সাধক শেখ আহমদ শেরহিন্দী। পশ্চিম আফ্রিকায় যিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হলেন কাদেরীয়া ত্বরীকার অনুসারী প্রখ্যাত সূফী সাধক উছমান দান ফদিও (Uthman dan Fodio)। এভাবে অজস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, সূফীরা জেহাদের বিরোধীতো নয়ই, বরঞ্চ তারাই হচ্ছেন জেহাদের অগ্রনায়ক। বলাবাহুল্য, সূফীবাদের বিকাশের ফলেই সেন্ট্রাল এশিয়া, চেচনিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ও অন্যান্য স্থানে ইসলাম বিকাশ লাভ করেছে। সুতরাং 'দাওয়া'র ক্ষেত্রে সূফীদের অবদান অপরিসীম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সূফীদের সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা হয় তার অধিকাংশই অমূলক, ভিত্তিহীন, ভ্রান্তধারণাপ্রসূত এবং পাশ্চাত্য অমুসলিম রচিত ইতিহাসের আলোকে বর্ণিত। এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস দিয়ে আমার এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি: "যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে 'অবিশ্বাসী' বলে, তা যদি সত্য হয় তবে তা যার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর যদি সত্য না হয় তবে তা যে ব্যক্তি 'অবিশ্বাসী' বলল, তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। অর্থাৎ সে নিজেই অবিশ্বাসী হয়ে যাবে।" (মুসলিম শরীফ)।

■ *ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী :*
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

কুরআনের আলো

॥ মুহাম্মদ রবিউল আলম ॥

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحيوة
الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك
هو الفوز العظيم -

অনুবাদ ঃ

মনে রেখো, যাঁরা আল্লাহ্‌র অলী, তাঁদের কোন ভয়-ভীতি নেই। তাঁরা চিন্তিত হবেন না। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহ্‌র কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।[১]

তফসীর ঃ

মহান রাব্বুল আলামীন কয়েকটি নিশ্চয়তাসূচক অব্যয় ব্যবহার করে বলেন, আল্লাহ্‌র অলীগণের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং তাঁরা চিন্তিতও হবেন না। আউলিয়া শব্দটি বহুবচন, যার একবচন হচ্ছে অলী। 'অলী' শব্দের শাব্দিক অর্থ নিকটবর্তী, সাহায্যকারী, অভিভাবক, মালিক, বাদশা ইত্যাদি।[২]

অলীর পরিচয় পরে বিশদভাবে আলোচনা হবে; তবে এখানে 'অলী' বলতে কারা? তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে সূফিকুল শিরোমনি আল্লামা ইবনুল আরবী বলেন — "স্বীয় সত্ত্বাকে 'ফানা' করে যে একত্ববাদের সত্ত্বায় ডুবে থাকে, তাকে অলী বলা হয়।"[৩]

ইমাম কুশাইরী বলেন, "যিনি কোন প্রকারের অবাধ্যতা ব্যতীত সর্বদা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের উপর অটল থাকেন, তাকে অলী বলা হয়।" আল্লামা ইবনু আজীবা শাফলী বলেন, "এখানে 'অলী' বলতে তাঁরাই উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ভালবাসে – আর আল্লাহ্ তায়ালাও মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের ভালবাসেন।[৪]

অলীর পরিচয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, "যাঁদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়, তারাই অলী।"[৫]

আল্লাহ্‌র অলীগণের কোন ভয়–ভীতি ও চিন্তা না থাকার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুহিউস সুন্নাহ্, ইবনুল আরবী বলেন — "সত্ত্বাকে ফানা করার পর তাঁদের এমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যা হারানোর ভয় হবে এবং এমন কোন লক্ষ্য থাকে না; যেখানে পৌছাতে গিয়ে লক্ষ্যচ্যুত হবার ভয় থাকে। আর তাঁদের মাকামে কামালিয়াত ও কামালিয়াতের স্বাদ মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হয় বিধায় তা হারানোর চিন্তাও তাদের নেই।[৬]

সূফী নিয়ামাতুল্লাহ্ বলেন — "যাঁরা সম্পূর্ণভাবে বশরিয়তের স্বভাব থেকে উর্ধ্বে ওঠে নফ্‌সের চাহিদা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তাঁদের কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা নেই; কারণ ভয়-ভীতি ও চিন্তা-পেরেশানির গুণ মানুষের স্বভাবগত। আর আল্লার প্রেমে তাঁরা 'ফানা ফিল্লাহ্' হয়ে বশরিয়াতের গুণ বা স্বভাব থেকে উর্ধ্বে ওঠে যাবার কারণে তাঁদের মধ্যে এমন কোন স্থান বাকী থাকে না, যার মাধ্যমে স্বভাবগত গুণের প্রকাশ ঘটবে।[৭]

ইমাম কুশাইরী আলাইহির রাহমাহ বলেন — "আল্লাহ্‌র অলীগণ মাকামে 'হাল' এবং 'মাকামে ওয়াক্ত' এর মধ্যে অবস্থানকালে কোন ভয়-ভীতি ও চিন্তা অনুভব করেন না; যেহেতু এ মকামে অবস্থানকালে তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং আল্লাহ্‌র রহস্যাদি তাঁদের অন্তরে আসে। আর তাঁদের সামনে যতই ভীতিকর ও চিন্তার উদ্রেককারী বস্তু আসুক না কেন তাঁরা তাতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে এবং ভয়-ভীতি ও চিন্তার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে না।[৮]

আবুল হাসান আলী মাতুরুদী বলেন — "আল্লাহ্‌র অলীগণ তাঁদের বংশধরদের অভিভাবকত্বের বিষয়ে ভয় করে না; কারণ আল্লাহ্‌ই তাদের অভিভাবক। আর তারা পার্থিব জীবন মৃত্যুর সময় এবং পরকাল সম্পর্কে মোটেই চিন্তিত নয়।[৯]

আল্লামা ইসমাইল হক্কী বলেন — "পার্থিব কোন ভীতিকর বা চিন্তার উদ্রেককারী কাজ তাদের মধ্যে ভয়ের বা চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে না।[১০] যেমন হযরত জয়নুল আবেদীন (রা) নামাযরত অবস্থায় তাঁর ঘরে আগুন লাগালে চতুর্দিক থেকে সবাই চিৎকার করে তাঁকে ঘর থেকে বের হবার জন্য বললেও তিনি কোন সাড়া দেননি। পরিশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে সবাই ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে

সিজদারত অবস্থায় পান। তাঁকে ঘর থেকে বের না হবার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, পরকালের আগুনের ভয়ে দুনিয়ার আগুনের ভয় নেই।[১১] ইসমাইল হক্কী বলেন, পার্থিব ভয় তাঁদের আঁচ করতে না পারলেও আল্লাহ্‌র ভয় তাদের মধ্যে প্রবল।[১২] যেমন হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাই একবার সারারাত কেঁদেছেন। এলাকাবাসী তাঁকে বললেন, আপনি পরহিজগার ব্যক্তি; কিন্তু সারারাত কেন কাঁদলেন? তিনি বললেন, আমিতো সেই দিনের ভয়ে কাঁদছি, যেদিন আল্লাহ্‌ তায়ালা হয়ত আমার কোন ভুলের কারণে আমাকে বলবেন, হে হাসান! আমার নিকট তোমার কোন স্থান নেই। আমি তোমার ইবাদতসমূহ প্রত্যাখ্যান করছি। তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে আরেকদিন ইবাদতখানার ছাদের উপর এমনভাবে কাঁদছেন, যার কারণে তাঁর চোখের পানির কয়েক ফোঁটা ইবাদতখানা পার্শ্বস্ত রাস্তার পথিকের উপর পড়লে সে চিৎকার দিয়ে প্রশ্ন করল, নিচে পতিত পানি পবিত্র না কি অপবিত্র? তিনি উত্তর দিলেন, হে ভাই, আপনার কাপড় পবিত্র করে নিবেন; কারণ এ পানি এক গুনাহগার ব্যক্তির চোখের পানি।[১৩] মূলত চোখের পানি পবিত্র।[১৪]

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —

ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله -

আল্লামা আলসী বলেন — পার্থিব জীবনে ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকার অর্থ হল – পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন যেমন পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাতদিন ব্যস্ত থাকে। আর আল্লাহ্‌র অলীগণ এ সকল অবস্থা থেকে ঊর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দু:খ-কষ্ট কোন লক্ষ্য করার মত বিষয়, যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।[১৭]

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক নবী তাঁদের উম্মতের গুনাহের জন্য ভীত ও চিন্তিত থাকবেন এবং প্রত্যেক উম্মতও স্বীয় গুনাহের জন্য ভীত ও চিন্তিত থাকবে; কিন্তু আল্লাহ্‌র অলীগণ ভীত ও চিন্তিত হবেন না; কারণ তাঁদের নেই কোন উম্মত, যার জন্য ভীত হতে হবে, নেই কোন অমার্জিত অপরাধ। তাঁদের মর্যাদা থেকে নবীগণ ঈর্ষান্বিত হবেন এবং বলবেন, এঁরা কারা? যাদের এত মর্যাদা এবং যাঁদের কোন ভয় নেই ও চিন্তাও নেই।[১৮]

হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يوم القيامة بمكانهم من الله، قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم وما أعمالهم، قال هم قوم تحابوا في الله غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية: - ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

"রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যাঁরা নবীও নন ও শহীদও নন, তাঁদের স্থান কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি হবে। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন তাঁরা কারা এবং তাঁদের আমল কী? তিনি বললেন, তাঁরা এমন ব্যক্তিসকল যাঁরা আল্লাহ্‌কে রাজি করার জন্য পরস্পর ভালবাসে; অথচ তাঁদের মধ্যে নেই কোন আত্মীয় সম্পর্ক, নেই কোন মালের লেনদেন। আল্লাহ্‌র শপথ নিশ্চয় তাঁদের মুখমণ্ডল হবে নুর সদৃশ উজ্জ্বল এবং তাঁরা অবশ্যই অবস্থান করবেন নুরের মিম্বারের ওপর। মানুষ যখন ভয় পাবে এবং চিন্তিত হবে, তখন তাঁরা না ভয় পাবেন, না চিন্তিত হবেন। এর পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন— [১৯]

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অলীর পরিচয় দিতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন

বলেছেন— "যাঁরা ঈমান এনেছে এবং পরহিজগারিতা অবলম্বন করেছে তারাই অলী।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহিউস সুন্নাহ ইবনুল আরবী বলেন— যাঁরা 'হক্কুল ইয়াকীন' এর সাথে ঈমান গ্রহণ করেছেন এবং 'মকামে হালে' অবস্থান কালে তাঁদের অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়কে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন, তারাই অলী।[২০]

ইমাম কুশাইরী আলাইহির রাহমাহ বলেন— উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যাঁরা আল্লাহ্‌র মা'রিফাত করেছেন এবং অবৈধ বস্তু থেকে বিরত থেকেছেন।[২১]

আল্লামা ইব্‌নে আযীবা আল শাযলী বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়তে বর্ণিত 'আউলিয়াল্লাহ' এর পরিচয়। আর এ আয়াতের অর্থ হবে– আল্লাহ্‌ ব্যতীত সকল কিছু থেকে তাঁদের অন্তরকে বিরত রেখেছে; কারণ অন্য কিছুতে তারা শান্তি পায় না।[২২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী আলাইহির রাহমাহ বলেন, যাঁরা পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনেছেন এভাবে যে, তাঁদের অন্তর সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে শান্ত এবং আল্লাহ্‌র বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে তাঁকে ভয় পায়।[২৩]

আল্লামা ইসমাইল হক্কী বলেন, আমার শাইখ বলেছেন যে, ঈমানদার ও মুত্তাকীগণ শরিয়ত ও তরিকতের পর্যায়ে খারাপ কাজ ও চারিত্রিক পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকে, হাক্বীক্বত ও মা'রিফাতের পর্যায়ে অলসতা ও 'মকামে হালে' অবস্থানকালে তাঁদের অবস্থা ও স্তর পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করা থেকে বেঁচে থাকে; কেননা তাঁরা শরিয়তের মাধ্যমে তাঁদের স্বভাবকে শুদ্ধ করে নেয়, তরিক্বতের মাধ্যমে কলবকে শুদ্ধ করে নেয় এবং হাক্বীক্বতের মাধ্যমে রুহকে শুদ্ধ করে নেয়।[২৪]

"দুফোঁটা পানি এবং দুটি চিহ্ন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ্‌র ভয়ে নিসৃত একফোঁটা চোখের পানি এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিসৃত এক ফোঁটা রক্ত। আর দুটি চিহ্নের একটি হচ্ছে– আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদের আঘাতের চিহ্ন বা পদচিহ্ন বা শিক্ষার্থীর কলমের কালির চিহ্ন এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফরজ কাজসমূহের কোন একটি আদায়ের চিহ্ন যেমন হাত-মুখে ওযুর চিহ্ন।"[২৫]

হযরত যুন্নুন মিসরী আলাইহির রাহমাহ বলেন, আল্লাহ্‌ ছাড়া সকল কিছু থেকে নির্ভয় হওয়াই হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়ের আলামত।[২৬]

তিনি তার মুর্শিদের বাণী বর্ণনা করার পর বলেন, মূলত তিনি 'তাকওয়ার' সর্বোচ্চ স্তরের কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে দূরে রাখে এমন সকল বস্তু থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর স্মরণে এমনভাবে মশগুল থাকা, যাতে কল্পনা-জল্পনা সব তারই হয়। এ 'ফানা ফিল্লাহ্‌' ও বাক্বাবিল্লাহ্‌র স্তরের গভীরতার তারতম্য ভেদে অলীদের মর্যাদার তারতম্য হয়। যেমন যারা শিরক ও কুফরী থেকে বেঁচে থাকে, তারা সাধারণ মু'মিন, যারা কবীরা ও সগীরা গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকে, তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের মুমিন এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা প্রকৃত মু'মিন ও অলী।[২৫] যেমন হযরত আবু হানিফা আলাইহির রাহমাহ একদিন বাজারে যাবার পথে তাঁর কাপড়ে সামান্য অপবিত্র ময়লা লাগলে তিনি নদীর পানি দ্বারা তা ধুয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মাযহাবে এতটুকু অপবিত্র বস্তু বৈধ; কিন্তু আপনি কাপড় ধুয়ে নিচ্ছেন কেন? তিনি বললেন, সেটা হচ্ছে শরিয়তের 'ফতওয়া' আর এটা হচ্ছে 'তাক্বওয়া'।[২৬] তিনি একটি এলাকায় জানাযার ইমামতি করতে গেলে, প্রচণ্ড রোদ থেকে বাঁচার জন্য এলাকাবাসী তাঁকে অনুরোধ করলেন, 'হুজুর আপনি এ ঘরটির দেয়ালের ছায়ায় একটু দাঁড়ান। তিনি বললেন, লোকটি আমার থেকে ঋণ নিয়েছেন। সুতরাং তার স্থানের ছায়া আমার জন্য বৈধ হবে না; কারণ ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে কোন প্রকারের উপকার লাভ করা সুদ। মূলত এটি তাক্বওয়ার বহি:প্রকাশ।[২৭]

একদিন হযরত ইব্‌রাহীম বিন আদহাম আলাইহির রাহমাহ নদী থেকে একটি আপেল খেলেন। খাবার পর চিন্তা করতে শুরু করলেন এটি খাওয়া বৈধ না কি অবৈধ এবং ভাবলেন যদি এটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করে তাহলে আমি কী উত্তর দিব। এরপর বাগানের মালিকের খোঁজে বের হয়ে মালিকের ঘরের সন্ধান পেলেন। তিনি মালিকের ঘরের দরজা নাড়ার পর ভিতর থেকে একজন দাসী বের হলে তাকে বললেন, এ বাগানের মালিক একজন মহিলা তথা আমি। বাগানটির অর্ধেক মালিকানা আমার আর বাকি অর্ধেকের মালিকানা বাদশার। আমি আমার মালিকানার অংশটির জন্য ক্ষমা করে দিলাম। তিনি পরে বলখের বাদশার নিকট গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। এটাই হচ্ছে 'তাক্বওয়া'।[২৮]

(১) আল-কুরআন, সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত নং ঃ ৬২–৬৪

(২) ইব্‌ন মনযুর, লিসানুল আরব, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, খঃ ১৫, পৃঃ ৪০৫

মুহাম্মদ ইবনু আবী বকর, মুখতারুস সিহাহ, মাকতাবাতে লিবানন নাশিরুন, বৈরুত, নতুন সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরী, খঃ ১ম, পৃঃ ৭৪০

(৩) ইবনুল আরবী, তাফসীর ইবনে আরবী, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত, খঃ ২য়, পৃঃ ১২৭;

(৪) ইমাম আল-কুশাইরী, লাত্বায়িফুল ইশারাত, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল আ-ম্মা লিল-কিতাব, মিশর, খঃ ২য়, পৃঃ ১০৫;

(৫) ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, দারুল বাশায়িরিল ইসলামী, বৈরুত, ১৪০৯ হিজরী, খঃ ১ম, পৃঃ ১১৯; ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিঃ, খঃ ৭ম, পৃঃ ৪৯৪

(৬) মুহিউদ্দিন ইবনুল আরবী, প্রাগুক্ত, খঃ ২য়, পৃঃ ১২৭

(৭) নিয়ামাতুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আল-ফাওয়াতিহুল ইলাহিয়্যাহ ওয়াল মাফাতিহুল গায়বিয়্যাহ, দারু রিকাবী লিন- নশর, মিশর, ১৯৯৯ ইং, খঃ ১ম, পৃঃ ৩৩৮(৮) নি'মাতুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, খঃ ২য়, পৃঃ ১০৫

(৯) আবুল হাসান আল-মাতুরীদী, আন-নিকাত ওয়াল উয়ুন, দারুল কুতুব, আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, খঃ ২য়, পৃঃ ১৪৪;

(১০) আল্লামা ইসমাইল হক্বী, রুহুল বয়ান, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরবী, বৈরুত, খঃ ৪র্থ, পৃঃ ৫৮

(১১) ইবনে কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, মাকতাবাতুল মায়ারিফ, বৈরুত, খঃ ৯ম, পৃঃ ১২৩–১২৪;

(১২) আল্লামা ইসমাইল হক্বী, প্রাগুক্ত, খঃ ৪র্থ, পৃঃ ৫৮;

(১৩) শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, তাজকিরাতুল আউলিয়া, ইসলামী তাবলীগী মিশন, মাটিয়া মহল, দিল্লী, পৃঃ ২০;

(১৪) আবুল হাসান আল আস-সগদী, আন-নিতফু ফিল ফাতাওয়া, মুয়াস্-সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরী, খঃ ১ম, পৃঃ ৩৫;

(১৫) ইমাম তিরমিযী, আস্-সুনান, দারুল গরবিল ইসলামী, বৈরুত, ১৯৯৮ ইং, খঃ ৩য়, পৃঃ ২৪২;

মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতিহ, তারিখবিহীন, কিতাবুল জিহাদ, খঃ ১১শ, পৃঃ ৪৮৩;

(১৬) শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬;

(১৭) আল্লামা আলুসী, রুহুল মা'য়ানী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরী, খঃ ৬ষ্ঠ, পৃঃ ১৩৮;

(১৮) আল্লামা ইসমাইল হক্বী, প্রাগুক্ত, খঃ ৪র্থ, পৃঃ ৫৮; মুফতি ইক্বতিদার খান নয়ীমী, তাফসীরে নয়ীমী, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, উর্দ্দু বাজার, লাহোর, খঃ ১১শ, পৃঃ ৩৯০;

(১৯) ইবনু হিব্বান, সহীহ, মুয়াস্ সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরী, খঃ ২য়, পৃঃ ৩৩২;

ইমাম কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াদ, ১৪২৩ হিজরী, খঃ ৮ম, পৃঃ ৩৫৭;

ইমাম সুয়ূতী, আদ্-দুররুন মনছুর, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৯৯৩ ইং, খঃ ৪র্থ, পৃঃ ৩৭৩;

ইবনে কাসীর, তাফসীরুল কুরআন, দারুল ফিকর, বৈরুত, নতুন সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী, খঃ ২য়, পৃঃ ৫১৪;

(২০) মহিউস সুন্নাহ ইবনুল আরবী, প্রাগুক্ত, খঃ ২য়, পৃঃ ১২৭;

(২১) ইমাম কুশাইরী, প্রাগুক্ত, খঃ ২য়, পৃঃ ১০৫;

(২২) আবুল আব্বাস ইবনু আজীবাহ আশ-শাজলী, আল-বাহরুল মুদীদ, মিশর, ১৪১৯ হিজরী, খঃ ২য়, পৃঃ ৪১৫

(২৩) সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, মাকতাবাতু রুশদিয়্যাহ, পাকিস্তান, ১৪১২ হিজরী, খঃ ৫ম, পৃঃ ৩৮;

(২৪) আল্লামা ইসমাইল হক্বী, প্রাগুক্ত, খঃ ৪র্থ, পৃঃ ৫৮;

(২৫) আল্লামা ইসমাইল হক্বী, প্রাগুক্ত, খঃ ৪র্থ, পৃঃ ৫৮;

(২৬) শেখ ফরিদুদ্দীন আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬;

(২৭) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭;

(২৮) আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর, সাচ্চী হিকায়াত, ৪র্থ হিস্যা, মাকতাবায়ে জামে নূর, দিল্লী, ১৪১৭ হিজরী, পৃঃ ৬৯–৭০।

হাদিসের আলো

॥ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী ॥

وعن عمرو بن العاص قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا بايعك فبسط يمينه فقبضت يدى فقال مالك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قلت ان يغفرلى --- الخ -

অর্থাৎ হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলাম। আমি আরজ করলাম, "আপনার হাত মোবারক বাড়ান, আমি বায়আত করবো"। হুজুরে পাক (দ) হাত বাড়ালেন, আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। রসূলে পাক (দ) ইরশাদ করলেন : হে আমর! একী হলো? আমি আরজ করআম, "কিছু শর্ত আরোপ করতে চাই। হুজুর করিম (দ) ইরশাদ করলেন, "কী শর্ত"? আমি আরজ করলাম, "আমি যেন ক্ষমা পেয়ে যাই। তিনি ইরশাদ করলেন : (হে আমর) তুমি কি জানোনা? ইসলাম পূর্বের গুনাহ বিলীন করে দেয়। হিযরত সেটার পূর্বের গুনাহ বিলীন করে দেয় এবং হজ্ব ও পূর্বের গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত শরীফ)

অত্র হাদিস এর কিছু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ :

(১) এ বায়াআত হলো পবিত্র ইসলাম ধর্মের বায়আত। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরাম (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় রসূলে আকরম (দ)-এর বরকতময় হাত এ বায়আত করেন। অর্থাৎ দ্বীন-ধর্মের উপর দৃঢ় থাকার অঙ্গীকার করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বায়আতের অনুসঙ্গ ও ক্ষেত্র হচ্ছে (ক) তওবা (খ) তকওয়া (গ) জিহাদ (ঘ) শাহাদাত (ঙ) কোন বিশেষ মাসসালার উপর।

এতদভিন্ন বর্তমানে সাধারণভাবে পীর-মশায়েখ এর হাতে যে বায়আত হয় বা হচ্ছে তা হলো তওবা ও তকওয়ার বায়আত। বায়আতের সময় আপন মুর্শিদ কিবলার হাত মোবারকে হাত দেওয়া সুন্নাত।

(২) ক্ষমা করা আল্লাহর কাজ, অথচ শর্তারোপ করেছেন রাসূলুল্লাহ (দ)-এর কাছে। অনুরূপ আমরাও বলতে পারি–ইয়া রাসূলুল্লাহ (দ) আমাদেরকে জান্নাত দান করুন। দোযখ থেকে আমাদের নাজাত নসীব হোক।

(৩) ঈমান ও সৎকর্ম গুনাহ মাপ হওয়ার মাধ্যম। যেমন কুরআনে পাকে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

ان الحسنات يذهبن السيئات

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নেক কার্যাদি মন্দ কার্যাদিকে দূরীভূত করে।

(৪) তাদের গুণাহ মাফ হয় বটে, বান্দার হক সমূহ মাফ হয় না।

وعن انس رضى الله تعالى عنه قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يسئلون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها -

বঙ্গানুবাদ : খাদেমে রাসূল (দ) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী করিম (দ)-এর পবিত্র বিবিগণের নিকট হুজুরে পাক (দ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য হাজির হলো।

যখন তাদেরকে ইবাদত সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন খুব সম্ভব তারা যেন তা কিছুটা কম মনে করলো। তারা বললেন–আমাদের সাথে নবী করিম (দ)-এর কী তুলনা হতে পারে? মহান রব তো তাঁর আগের ওপরের (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সুতরাং তাদের মধ্যে একজন বললেন, "আমি প্রত্যহ সারারাত নামাজ পড়তে থাকবো।" দ্বিতীয় জন বললেন, "আমি সর্বদা দিনের বেলায় রোজা রাখবো, কখনো রোজা ভাংবো না। তৃতীয়জন বললেন, "আমি নারীদের থেকে পৃথক থাকবো, কখনো বিয়ে করবোনা।"

এরপর নবী করিম (দ) তাঁদের নিকট তশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন : "তোমরা ঐসব লোক, যারা এমন এমন বলছো, সাবধান! আল্লাহ্রই শপথ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্কে অধিক ভয় করি এবং আমি হলাম অধিক তকওয়া অবলম্বনকারী; কিন্তু আমি রোজাও রাখি ইফতারও করি (রোজা ছেড়ে দিই), নামাজও পড়ি, নিদ্রাও যাই, বিবিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হই। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়; সে আমার নয়, (বুখারী

শরীফ, মুসলিম শরীফ)

উক্ত হাদিস থেকে প্রতিভাত হয় যে,

(ক) রাসূলে পাক (দ)-এর রাতের ইবাদত সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর কোন পুণ্যবতী বিবির নিকট হাজির হয়েছিলেন, নতুবা দিনের ইবাদত সম্পর্কে তো তারা জানতেনই। (খ) কেননা তাদের ধারণা ছিলো যে, হুজুরে পাক (দ) সারা রাত জেগেই থাকেন এবং ইবাদত ছাড়া কোন কাজই করেন না, কিন্তু এটাই তাদেরকে জানানো হয়েছিল যে, রাতে তিনি নিদ্রাও যেতেন, জেগেও থাকতেন এবং জাগ্রত অবস্থায় ইবাদতও করতেন, পার্থিব কার্যও সম্পাদন করতেন। তখনি তাদের মনে ঐ ধারণা জাগলো। (গ) নিষিদ্ধ ৫ দিন ব্যতীত বৎসরের প্রতিদিন রোজা রাখা যায়। ঐ নির্ধারিত দিবসগুলো হলো শাওয়াল মাসের প্রথম দিন (ঈদুল ফিতর), কোরবানী ঈদের দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ তারিখ। (ঘ) এখানে উৎকৃষ্ট শিক্ষা রয়েছে যে, হুজুরে আকরম (দ) আমাদেরকে খৃষ্টান এবং সন্যাসীদের ন্যায় সংসার বিরাগী বানান নি বরং দুনিয়াকেও দ্বীন বানিয়েছেন। কেননা রসূলে পাক (দ)-এর প্রতিটি কর্ম সুন্নাত।

সুতরাং ইফতার করা, তাহাজ্জুদ পড়া, বিবাহ করা, সন্তান অর্জন করা দুনিয়াবী কাজ কারবার ইত্যাদি সমভাবে প্রিয় নবীর ত্বরীকা ও সুন্নাত। এগুলো সওয়াব অর্জনের পুণ্য পন্থা। (ঙ) যে ব্যক্তি সুন্নাতকে খারাপ মনে করবে সে ইসলাম বহির্ভূত। অথবা যে ব্যক্তি কোন ওজর ব্যতীত সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায় সে আমার পরহেজগার উম্মতের দল থেকে বহিষ্কৃত। সুতরাং হাদিসের বিপক্ষে কোন আপত্তি নেই। (চ) বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্নাত। আবার কখনো ফরজ, কখনো হারাম। (ছ) তকওয়া বা পরহেজগারী যা সুফীতত্ত্বের একটি দিক নির্দেশনা তা রসূলে পাক (দ)-এর আনুগত্য দ্বারাই অর্জিত হয়। রাতে যেমনিভাবে আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করা সুন্নাত, ওই রাতে অনুরূপ আরামে নিদ্রা যাওয়াও সুন্নাত ও ইবাদত। কেন না উভয়টি নবী করিম (দ)-এর তরীকাভুক্ত।

وعن ابي هريرة رض الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما يخشى الذى يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار -

বঙ্গানুবাদ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের মাথা ইমামের পূর্বে উঠিয়ে নেয়, সে এতে ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তার মাথা গাধার মতো করে দেবেন।" (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

অনুসাঙ্গিক বিশ্লেষণ : উক্ত হাদিস শরীফ ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না তবুও বিশেষ একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যেটা মিশকাত শরীফের হাশিয়াতে হযরত শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) আরবী ভাষায় বিবৃত করেছেন তাহলো–এক মুহাদ্দিস দামেসকের এক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট হাদিস শিখতে যান। ওই শায়খ পর্দার আড়ালে অবস্থান করে তাঁদেরকে হাদিস পড়াতেন। একদিন তাঁর বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে পর্দা উঠালেন। তখন দেখেন, উক্ত মুহাদ্দিস (শিক্ষক মহোদয়)-এর চেহারা গাধার মতো ছিল। (এটার কারণ জিজ্ঞাসা করলে) তিনি বললেন, "আমি উক্ত হাদিস শরীফকে বিবেক গ্রাহ্য নয় মনে করে পরীক্ষা করার জন্য ইমাম থেকে অগ্রগামী হয়েছিলাম অর্থাৎ ইমামের আগে আগে রুকন আদায় করছিলাম। ফলে, এ বিপদে আক্রান্ত হই।" প্রমাণিত হলো–ইমাম থেকে অগ্রগামী হওয়া এতো বড় অপরাধ যে, এতে আকৃতি পর্যন্ত বিকৃত হতে পারে।

যদি কখনো তা নাও হয়ে থাকে, তবে তাও রসূলে পাক (দ)-এর রহমতেরই কারণে। পার্থিব জীবনে এ শাস্তি দেয়া না গেলেও আখেরাতে তা অবশ্যম্ভাবী, তাই তা সর্বদা বর্জনীয়।

মাসিক আলোকধারা

একটি মননশীল পত্রিকা। সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় ও আলোকিত জীবন গঠনে আলোকধারা লেখনীর মাধ্যমে গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে। তাই এটি আপনিও পড়ুন, অন্যকেও পড়তে দিন। আলোকধারায় লিখুন ও বিজ্ঞাপন দিন।

"সূফীতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা"

॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ গোফরান ॥

সূফীবাদ বহু মতের বহু পথের বহু বিশ্বাসের নির্যাস। সকল সাধনার চূড়ান্ত ফল। একটি সুনির্দিষ্ট মত, পথ এবং বিশ্বাস মানুষকে মুক্তি দিতে পারে । সকল সাধনার চূড়ান্ত আধ্যাত্মকরণ সূফীদর্শনে সম্ভব।

ইসলামের চূড়ান্ত অধ্যাত্মবাদকেই সূফীর ধর্ম বলা হয়। ইব্নে সিরিন (মৃ: ৭২৯) বলেছেন-"I prefer to follow the example of the prophet who dressed in cotton." অর্থাৎ পশমী বস্ত্র পরিধানকারী নবীজী (স) কে অনুসরণ করতে আমি অধিকতর পছন্দ করি।

সূফীতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে অনেক সূফী ব্যক্তিত্বের জীবন, কর্ম সাধনা ও ধর্ম ইত্যাদিতে প্রকৃত সূফীর পরিচয় মিলে। সূফী সাধকদের দুনিয়ার মায়া, মোহ, লোভ, লালসা, হিংসা, ঈর্ষা, অহংকার কোনটিই জয় করতে পারে না। আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে তারা থাকেন সদা ব্যাকুল।

সূফী মহান আল্লাহ্তায়ালাকে সন্ধান করেন এই পৃথিবীতে সর্বত্র। সূফীর ধর্ম মহান আল্লাহ্কে তাঁর অন্তরঙ্গ করে তোলা। হযরত মুহাম্মদ (দ)-এর দিবা রাত্রির প্রার্থনা ছিল-'দারিদ্রই আমার ঐশ্বর্য'। পরবর্তীকালে বহু সূফী সংঘ এটাকেই মন্ত্র বলে জেনেছিলেন। দারিদ্রকে বরণকারী ফানাফিশ শায়খ সূফী সাধকগণ দারিদ্রকে নিত্য সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন। তারা দারিদ্রকে ঐশ্বর্য বিবেচনায় সাদরে গ্রহণ করেন। অতি সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানে অভ্যস্ত সূফী সাধকগণ। জাকজমকপূর্ণ জীবন কখনো পছন্দ করেন না তাঁরা। মহান আল্লাহ্তায়ালার কুদ্রত সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে অনুভব করা যায়। নিজের ভেতরে মারিফাতের আলো জ্বালা সূফীর জীবন কর্ম। মহান আল্লাহ্তায়ালার ভয় ও ভালবাসায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন তিনি। তাপসী সূফী রাবেয়া (মৃ: ৮০১)-র জীবন আমাদের আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত রাবেয়ার জীবন সাধনা ঘোষণা করে "The mainspring of mysticism is love" অর্থাৎ "সূফীতত্ত্বের মূল উৎস হচ্ছে প্রেম"। তাপসী বলেন- "Love of God hath so absorbed me that neither love nor hate of any other thing remains in my true heart " অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেম আমাকে এত বিভোর করেছে যে, আমার অন্তরে অন্য কোন বস্তুর প্রতি ভালবাসা কিংবা হিংসা কোনটিই অবশিষ্ট নেই। এ উপলব্ধি মানুষকে বলতে শেখায় Comtemplation থেকে illumination অর্থাৎ অপ্রেম থেকে প্রেম, অন্ধকার থেকে আলো, আর এটাই সূফী সাধকের জীবন। এই জীবনের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল পারস্য-দেশের সূফী মনসুর আল হাল্লাজের জীবনেও। তিনি আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ভাবতে পেরেছিলেন। নশ্বর দেহ মহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত নৈবেদ্য। সূফী মনসুরের আর্তি বুঝতে হলে নিচের কথাগুলো আগে বুঝে নিতে হবে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান আল্লাহ্তায়ালাকে দিবারাত্রি অহরহ উচ্চারণ করতে হয়- "There is no god but God (La ilaha illallah)" অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" একে ইংরেজীতে ইসলামবিদরা বলেছেন-"Revealed testification" এবং কোরআনের ভাষায় Shahadah বলা হচ্ছে।

অনেক সাধ্য সাধনা করে অন্তহীন পথ পেরিয়ে নিজ এবং ভক্তকে আল্লাহ্তায়ালার সান্নিধ্য লাভ করানোর চেষ্টায় রত থাকেন সূফী সাধকরা। আল্লাহ্তায়ালার শত নাম। এই নামগুলো দিয়ে Divine Essence কে বোঝার নিমিত্ত আল্লাহ্র যিকির এর মাধ্যমে স্বর্গীয় অনুভূতি অনুধাবন করার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা, আর সেটাই একজন সূফীর জীবনাদর্শ। এ আদর্শের মূর্তপ্রতীক একজন সূফী সাধক। সূফী মনসুরের আত্মোপলব্ধি ছিল "I am the Truth" অর্থাৎ "আমিই সত্য", আমার দ্বারা সত্য প্রকাশিত। সূফী সাধকদের জীবন ও কর্মে সূফী মনসুরের এ উপলব্ধির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। সূফী মনসুর হাল্লাজ বলেন, "I saw my Lord with the eye of

my heart" অর্থাৎ আমি আমার অর্ন্তচক্ষু দ্বারা আমার প্রভুকে দেখেছি।" সূফীর ভাষায় প্রতিবাদ আছে। এদের ভাষা নিজেদের সৃষ্টি। এ এক মনোরম সার্থক ভাষা। এই ভাষা "Vital dialogue between God and man" "খোদা এবং মানবের মাঝে যোগাযোগের অন্যতম কথোপকথন। সূফী সাধকগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে এমন যোগাযোগ স্থাপন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে গভীর মনোযোগ। আল্লাহ্‌পাকের সাথে অনন্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন সূফী সাধকগণ।"

একে সাধারণ সাক্ষাৎকার বলা যাবে না। সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাপনে একটা দীনতা প্রকট হয়ে উঠে। সূফীরা কিংবা সাধুসন্তরা এ দীনতাকে লালন ফকিরের ভাষা দিয়ে, আউলিয়া কেরামের জীবনাদর্শ দিয়ে ঘুচিয়ে দিতে পারে। একদিন অকস্মাৎ অনুভবে বোঝে এই দেহ মনে কিসের এক আগুন ধরেছে। এ আগুন এ জীবনে নিভে যাবার নয়। এই দহনজ্বালা আল্লাহ্ তায়ালার প্রেমের নিদর্শন। সূফী কবি জালাল উদ্দিন রুমি বলেন- "I was a devout man, you made me a singer" অর্থাৎ "আমি ছিলাম এক সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান আপনার প্রেম আমাকে বানিয়েছে গায়ক।" অর্থাৎ সূফীদের কোন বিশেষ রীতিতে, বিধানে, বন্ধনে বাধার উপায় নেই। কেবল নতুন নতুন উদ্বোধনে আলোকিত হতে পারাই একজন সূফীর জীবনের ধর্ম। আল্ গাজ্জালী (রহ) সূফী দর্শন ও তার দার্শনিক তত্ত্বের মাধ্যমে এ গভীর উপলব্ধির কথা বলেছেন। ইরান থেকে ভারতবর্ষে সূফীদের জীবন প্রবাহ সংগীতে ও সাধনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। সূফীদের এ রহস্যাবৃত জীবনে আধ্যাত্মিকতার আলো, গান আর মানব বন্ধুর সাহচর্য লক্ষ্য করা যায়। সূফীরা আধ্যাত্মিকতার এমন উচ্চ আসনে পৌঁছে যান যে তাঁরা আকাশে বাতাসে, পাখির কণ্ঠে, জলের স্রোতে মহান আল্লাহ্‌কে অনুভব করেন। আল্লাহ্‌র সাথে সার্বক্ষণিক ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হল সূফীদের জীবন লীলা। মাইজভাণ্ডারী সূফী দর্শনে এর অস্তিত্ব ও উপলব্ধি খুজে পাই।

খোদা প্রেম পিপাসুরা খোদা প্রেমের অনন্ত মহাসাগরে ডুবে থাকেন। গভীর সাধনার মাধ্যমে তাই একজন সূফী সাধক যথার্থই বলতে পারেন এ জীবন অনেক রহস্যাবৃত।

দার্শনিক সূফীবাদকে সুনিপুনভাবে ইসলামের সংসারে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার প্রবর্তক হযরত গাউসু আযম মাওলানা শাহ্‌সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক)। এ জীবন আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও জগৎকে বাদ দিয়ে নয়। জীবন ও জগতের অমোঘ নিয়মের মধ্যে সূফী দর্শনকে স্বাভাবিক করে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম একজন প্রকৃত সূফী সাধক। চূড়ান্ত অর্থে আধ্যাত্মিক সাফল্য তাদেরকে সংবর্ধিত করে। একাধিক অর্থে সূফীতত্ত্বের রূপান্তর ঘটে একজন সূফীর চিন্তায় ও সাধনায়। তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করেন। পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া ও চলাফেরা অতি সাধারণ ও মার্জিত। সব সময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হন তাঁরা। নিরহংকার এ ব্যক্তিদের নিকট টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, দুনিয়ার ক্ষমতা কোনটির জন্য বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আধ্যাত্মিক রহস্যময় জগতের এ ইনসানে কামেলগণ সীমাবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তাঁরা মানবাত্মার মুক্তি সাধনের পথ প্রদর্শনকারী সিদ্ধ পুরুষ। সূফীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব মনের পরিশুদ্ধতা অর্জন। পবিত্র কোরআনের সূরা আল-আলায় আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে সেই সফলকাম।" (৮৭ : ১৮) মানব মনের এ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন 'এখলাস' বা একনিষ্ঠতা যা মানব হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম। আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখতে পাই যে, সূফীতত্ত্ব বা তাসাউফ জ্ঞানের অধিকারী মহান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে তাসাউফ জ্ঞান পিপাসু ভক্ত অনুরক্তরা তাদের চারিপাশে বসে সূফীবিদ্যা গ্রহণ করে আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জনে সফলকাম হয়েছেন। ইমাম গাজ্জালীর ইন্তিকালের পর তার মাথার নিচে যে চরণদ্বয় পাওয়া গিয়েছিল তা যেন একজন সূফীর শেষ মর্মবাণী।

"A bird I am : This body was my cage
But I have flown leaving it as a token"

অর্থাৎ "আমি হলাম একটি পাখি আর আমার শরীর ছিল এর পিঞ্জর। কিন্তু আমি আজ (পিঞ্জর থেকে) উড়াল দিয়েছি আর এ শরীরটাকে প্রতীক হিসেবে রেখে এসেছি।"

আত্মশুদ্ধির মাস পবিত্র রমজান

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের শুভবার্তা

❖ আ ব ম খোরশিদ আলম খান ❖

মোহ আসক্তি স্বার্থ তাড়নায় ওষ্ঠাগত নাগরিক জীবনে একটু অন্যরকম দিন খুঁজে পেতে চায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। সীমাহীন বিড়ম্বনা ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে বছরের এগারটি মাস পার করার পর একটি মাস আসে ভিন্ন আবহে, ভিন্ন আমেজে। আত্মশুদ্ধি ও পুণ্যানুভূতি জাগৃতির সেই পবিত্র রমজান এলো ফিরে। কোটি মুসলমানের প্রাণে প্রাণে বয়ে যাচ্ছে আজ আনন্দধারা। বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে শুরু হল সিয়াম উৎসব। পাপাচার অনিতাচারের বেড়ি ভেঙে সবাই আজ শামিল ঐশী আবাহনে পুণ্যকর্মের মিছিলে। মানুষে মানুষে মেলাবার পরিশুদ্ধ হবার বার্তা নিয়ে এসেছে মাহে রমজান। স্রষ্টার সাথে তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষের সেতুবন্ধের মাধ্যমে শুভ শক্তি শুভ চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়ে পরিবর্তনের বুলন্দ ডাকে বারে বারে একটি মাস ফিরে আসে– মাহে রমজান। আত্মিক উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষ, মানবিক গুণাবলী অর্জন, ইহ ও পারলৌকিক মুক্তি, নিরাপদ বাসযোগ্য মানবিক সমাজ গড়ায় মানুষের যা কিছু প্রত্যাশা তার সবই রয়েছে রমজানের সিয়াম দর্শনে। সংযম, সহনশীলতা, পরহিতৈষী চেতনা লালন, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও পুণ্যময় সার্থক জীবন গঠনের প্রেরণাদায়ী পবিত্র রমজানের আগমনে তাই লাখো কোটি বিশ্বাসী মানুষ ভিন্ন অনুভূতি আমেজে জানাচ্ছে– স্বাগত মাহে রমজান। এসো এসো করুণা, ক্ষমা ও মুক্তির দুয়ার উন্মোচনকারী হে মাহে রমজান। আমাদের যত হতাশা, বেদনা, গ্লানি, পরিতাপ ও অভাব–বঞ্চনার ভার হালকা করো তোমার করুণাধারায়– মাহে রমজান। কুরআন মজিদ অবতীর্ণের মাস রমজান– আস্সালাম! রোজা, তারাবিহ, সাহরি, ইফতারের জান্নাতি আয়োজনে নিবেদিত আজ বিশ্ব মুসলিম। রোজার কল্যাণময়তায় প্রাণিত–শাণিত বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান মানুষেরা।

বাংলাদেশের পশ্চিমাকাশে এক ফালি রূপালি বাঁকা চাঁদের উদয়ের মধ্যে দিয়ে শুরু হল মাসব্যাপী সিয়াম–উৎসব। কঠোর আত্মসংযম, বাক সংযম, রিপুর দমন, সীমালঙ্ঘন থেকে ফিরে আসার এলো অবারিত সুযোগ। ইবাদত–বন্দেগির মাধ্যমে পুণ্যসিক্ত, আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও অনুগ্রহধন্য হবার দুয়ার উন্মুক্ত। পবিত্র রমজানের সদর দরজা প্রশস্ত সকলের জন্য। মানবসৃষ্ট মূল্য সন্ত্রাস, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নাগরিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে আমাদের নিত্য পথচলা। সংকট সমস্যা যতই থাক সব ডিঙিয়ে মুসলমানরা রোজার দিনগুলো ভালোয় ভালোয় কাটবে– এ প্রত্যাশায় গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ঈমানী উদ্দীপনায় বরণ করে নেয়– মাহে রমজান। স্বস্তি শান্তি হয়ত এটুকুই– জনগণের সরকার গণবান্ধব নীতি গ্রহণ করে এই মাসটিতে অন্তত নাগরিক যন্ত্রণা– সংকট–সমস্যা থেকে দেশবাসী ও রোজাদারদের বাঁচাতে শক্তি–সামর্থ্য–সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দেবেন। অশেষ অপ্রাপ্তি ও হতাশার মাঝেও সিয়াম–উৎসব সবার যোগে উৎসবমুখর হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশা সকলের, অগণিত রোজাদারের। রোজা, নামাজে তারাবিহ, সাহরি, ইফতার মাহে রমজানের সব আয়োজন স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে পালিত হবে এই আশাবাদ সবার। ইবাদতে শিথিলতা, কর্তব্যকর্মে সীমালংঘন ও অনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ইতি ঘটুক রোজার পুণ্যধারায়।

প্রতিটি ধর্মাবলম্বীর কাছে ধর্মীয় বিধান, বিধি নিষেধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের মূল বাণীই হচ্ছে আত্মকল্যাণ ও পরকল্যাণে মানুষকে পরিচালিত করা। ইসলাম শুধু ধর্মই নয়– পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। যা কিছু ভালো, কল্যাণময় ও সহজসাধ্য– তাই ইসলাম। ঐশী গ্রন্থ কুরআন মজিদে বলা হয়েছে লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা– মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ্‌ তাকে কিছুই চাপিয়ে দেন না'। সিয়াম সাধনার নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। রোজা বা সাওম পালন ইসলামের অন্যতম ফরজ বা আবশ্যকীয় দায়িত্ব। ঈমান ও নামাজের পরই রোজার গুরুত্ব ও মর্যাদা। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয় সম্ভোগ বর্জনই রোজা। রোজা ফার্সি প্রতিশব্দ। আরবিতে বলা হয় সাওম। এই সাওমের বহুবচন সিয়াম। মাহে রমজানের মাস জুড়ে ৩০টি রোজাই (সাওম) যেহেতু পালন করা ফরজ– তাই বহুবচনে বিশেষিত করে সিয়াম বলাই যুক্তিযুক্ত। রোজার আত্মিক, শারীরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। কুরআন মাজিদের সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াত থেকে ১৮৮নং আয়াতে রোজার বিধানের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হল, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া (খোদাভীরু ন্যায়নিষ্ঠতা) অর্জন করতে পার। এই কয়েকটি আয়াতে কুরআনের অনবদ্য শৈল্পিক ভঙ্গিমায় রোজার আবশ্যকতা, এই মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, দর্শন, করণীয় ও পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত অথচ নিবিড়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– ফামান শাহিদা মিনকুমুশ্ শাহ্‌রা ফাল্‌ইয়াসুমহু– তোমাদের মধ্যে যে রমজান মাস পাবে সে যেন এই মাসে রোজা পালন করে। আলোচ্য আয়াতে মাহে রমজানে রোজা রাখার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, গুরুত্ব ও এর সময়কাল ব্যক্ত হয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। প্রিয় নবীর (দ) বাণী হাদিস শরিফেও রোজার প্রয়োজনীয়তা, মাহাত্ম্য ও ফজিলত গুরুত্বের সাথে বহুভাবে আলোকপাত হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে রোজার প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ পাক বলেন– আস্সাওমু লী ওয়া আনা আজযী বিহী– রোজা আমার জন্য, আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব। আল্লাহ্‌ পাক প্রতিটি ইবাদতের পুরস্কার ও প্রতিদান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, কিন্তু রোজার জন্য পুরস্কার নির্দিষ্ট করেন নি বরং প্রতিদান সম্পর্কে বলেছেন– রোজাদারদের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্‌পাক। এতে বোঝা যায়, রোজার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও অনন্য মাহাত্ম্য। রোজার তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম দশ দিনের নাম আশারায়ে রহমত–রহমতের দশ দিন। সাধারণভাবে এ দশ দিনে সকলের জন্য অবারিত রহমত বা করুণাধারা বর্ষিত হয়। দ্বিতীয় দশ দিনকে বলা হয় আশারায়ে মাগফেরাত–ক্ষমার দশ দিন। এ দশ দিনের প্রতিদিন আল্লাহ্‌ পাক লাখো লাখো রোজাদারের প্রার্থনা কবুল করেন। তৃতীয় দশদিন হচ্ছে আশারায়ে নাজাত– দোজখ হতে পরিত্রাণ লাভের সুযোগ। এই দশ দিনে প্রতিটি মুমিন যারা সামান্যতম ঈমান রাখে আল্লাহ্‌ পাক তাকে নিজের দয়া ও করুণা দ্বারা ক্ষমা করে দেবেন।

মাহে রমজানে সর্বস্তরের রোজাদার এবং ভোক্তা সাধারণ মজুতদারি ও মুনাফাখোরীর দুঃসহ প্রবণতা থেকে বেঁচে নিরাপদে– নির্বিঘ্নে

মোটামুটি খেয়ে পরে যাতে মাসটি পার করতে পারে–এই হোক আমাদের শপথ। ব্যবসায়ী ভাইদের মধ্যে শুভবুদ্ধি ও মানবিকতার উজ্জীবন ঘটুক এই প্রত্যাশা তাদের কাছে। রহমত মাগফেরাত নাজাতের দিনগুলোতে নাগরিক শান্তি থাকুক অটুট। প্রসন্ন চিত্ত ও মানবিকবৃত্তির চর্চা হোক অন্তত রোজার এই মাসে।

সব দেশে রোজায় পণ্যমূল্য কমে, এখানে কেন চলবে লুণ্ঠনবৃত্তি! : সংযম সাধনা ও আত্মশুদ্ধির বার্তার মাধ্যমে রোজাদারকে শুদ্ধচারি জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে মাহে রমজান। অথচ রোজার মাস এলে একদিকে শোনা যায় অবিরত সংযম সাধনার ডাক, অপরদিকে চলে নিত্য অসংযম ও অমিতাচার। ভোজন-আহ্লাদে মত্ত থাকা বা কাউকে ভোগ-বিলাসে ডুবিয়ে রাখার জাগতিক কোনো বিষয়ের সাথে রোজার কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও লাখ টন ছোলা এক দিনেই নিঃশেষ হয়ে যায় এই রোজায়। ইফতারির নামে ভোজন উৎসবে একাত্ম হয়ে গেলে তখন এ ধরনের পণ্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরা আদৌ সম্ভব কি–না তা সর্বাগ্রে ভাবতে হবে ভোক্তা রোজাদারকে। বাজারে কোনো পণ্যের চাহিদা খুব বেড়ে গেলে এর সুযোগ নেয় মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ীরা। রোজায় পণ্যমূল্যের অযাচিত বৃদ্ধির জন্য তাহলে ব্যবসায়ী ও রোজাদার দু'পক্ষই যে অভিযুক্ত তা অস্বীকার করা যাবে কী? ব্যবসায়ী এবং রোজাদার ভোক্তারা যদি লুণ্ঠনবৃত্তি ও অসংযমে নিমগ্ন হন বাড়ে পণ্যমূল্য, বাড়বে ভোগান্তি। হালাল ব্যবসা বাণিজ্য তো প্রিয় নবীর (দ) সুন্নাত। কিন্তু ব্যবসার আড়ালে প্রতারণা ও ঠকবাজির আশ্রয় নেয়া জুলুম। ব্যবসায় ন্যূনতম প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হলে ব্যবসার সমুদয় আয় হারাম উপার্জনের শামিল। মধ্যপ্রাচ্যসহ সব মুসলিম প্রধান দেশে রোজার মাস এলে জিনিসপত্রের দাম আশাতীতভাবে কমে গেলেও আমাদের দেশে তার বিপরীত দৃশ্যই লক্ষণীয়। এখানে দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হচ্ছে রোজার মাস মানেই চুটিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে ভোক্তাদের পকেট খোয়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যবসায়ীদের দৌড়ঝাঁপ। রোজা রেখে, নামাজ পড়ে, ধর্মেকর্মে বেশ অগ্রসর হয়েও যারা ব্যবসার আড়ালে আমজনতাকে দুঃসহ দুর্ভোগে নিক্ষিপ্ত করছে তা কোনোভাবেই ব্যবসার স্বাভাবিক রীতিনীতি হতে পারে না। তা লুণ্ঠনবৃত্তিরই দৃশ্যমান নমুনা।

ইসলামের বাণিজ্যনীতি অত্যন্ত ভোক্তাবান্ধব ও ব্যবসানুকূল। যেমন হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হালাল ও বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জন করা ফরজ নামাজের পর ফরজ"। (বায়হাকি) অন্য আরেকটি হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "কোনো বান্দা যদি হারাম বা অবৈধ পন্থায় ধন-সম্পদ উপার্জন করে তা থেকে দান করলে তা গৃহীত হবে না, তা থেকে ব্যয় করলে তাতে বরকত বা সাওয়াব দেয়া হবে না। আর সে যদি তা পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে যায়, তাহলে সে যে জাহান্নামের অবলম্বনই রেখে গেলো"। আরেকটি হাদিসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "হারাম খাওয়ার মাধ্যমে বর্ধিত শরীর জান্নাতে যাবে না।" (বায়হাকি) হাদিসের এ নির্দেশনা অনুসরণে চাই সকলের সচেতনতা।

ঈমানদার মুসলমানরা মাহে রমজানের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্টি লাভের জন্য তৎপর থাকেন। আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুকে আজম (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নূর নবী হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন– " যে ব্যক্তি পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে তন্ময় থাকে তার পাপরাশি মোচন হয়ে যায়। প্রার্থনাকারী কখনো বিফল মনোরথ হয় না"। সবাইকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য হালাল রিযক তক্ষণ করা প্রধান শর্ত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "অনেক প্রার্থনাকারী হাত উত্তোলন করে ইয়া রব ইয়া রব (ও হে প্রভু ওহে প্রভু) শব্দে প্রার্থনা করে থাকে, তাদের অবৈধ পানাহার ও অবৈধ ভূষণে কীরূপে দোয়া মঞ্জুর হবে? আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, " হে মুমিনরা তোমরা আমার প্রদত্ত হালাল পবিত্র রিযক থেকে তক্ষণ করো।" অথচ ইসলামের এই নির্দেশনা কেউ মানে বলে মনে হয় না। মাহে রমজান আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরসহ সব জিনিসেরই দাম বেড়ে যায়। অসাধু ব্যবসায়ীরা মাহে রমজানকে 'দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতার মাস' বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অধিক মুনাফা লাভের মাস হিসেবে ফায়দা লুটছে যুগ যুগ ধরে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন সভা-সেমিনার বিবৃতি দিয়ে এবং সাংবাদিক ও লেখকরা তাদের লেখনীতে জোরালোভাবে এ তৎপরতা বন্ধের আহ্বান জানালেও অবস্থার পরিবর্তন হয় বা হয়েছে এমনটি কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও ব্যবাসায়ীদের ভূমিকা নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। চাল, ডাল, তেল, মরিচ, শাক-সবজি, তরি-তরকারিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীর দাম বিগত দিনের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ফলে রোজাদারসহ সমগ্র দেশবাসী বিশেষ করে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তরা বাজারের হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আর বিত্তহীন গরিব দরিদ্র অসহায় লোকেরা কী কষ্টে দিনাতিপাত করছেন, তা ভাষায় বর্ণনাতীত। যারা এসব দেখভাল করার কথা, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার কথা– সেই সরকার বাহাদুর ও তার মন্ত্রীরা বল্গাহীন উক্তি, ঠাট্টা মস্করা, পরস্পর দোষারোপ ও অব্যবস্থাপনায় দেশ ও দেশের মানুষকে এক দুর্বিষহ অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি মন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতেও অবস্থার কোনো হেরফের হয় না। বরং এবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মনগড়া সিদ্ধান্তে ভোজ্যতেলের দাম আরেক দফা বৃদ্ধির সুযোগ লুফে নিয়েছে ব্যবসায়ীরা। সব সরকারের আমলে রোজার দিনে পণ্যমূল্য নিয়ে তুলকালাম চলে আসলেও এই জায়গায় সবার ব্যর্থতা স্পষ্ট। আবার অনেক ক্ষেত্রে এখানে সরকারের নির্দেশের চেয়ে অসৎ ব্যবসায়ীদের খুঁটির জোর ও আস্ফালন বেশি ক্রিয়াশীল। একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে, একটি সুশীল-সভ্য সমাজে এমনটি হওয়ার কথা নয়। বস্তুত ইসলামে ব্যবসাকে সবচেয়ে সম্মানজনক উপার্জনের পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ব্যবসার নামে দস্যুবৃত্তি ও ফায়দাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের নির্দেশনা অত্যন্ত কঠোর।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন "আহাল্লাল্লাহুল বায়'আ ওয়া হাররামার রিবা" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। ঐশী এই নির্দেশনা অনুধাবন ও অনুসরণে আমাদের সদিচ্ছা নিয়ে আজ প্রশ্ন তোলা যায়। দেশজুড়ে আমরা কী দেখছি? এ কেমন ব্যবসা? অপরের হক ধ্বংস করে নিজে শাদ্দাদি সম্পদ গড়ে তোলার ব্যবসা? না। কখনোই তা চলতে দেওয়া যায় না। বরং এ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছেন স্বয়ং শরিয়ত প্রবর্তক হযরত রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। হযরত আবু (আমামা রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হলে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন তা আটকিয়ে রাখে, সে সেই সমস্ত খাদ্যশস্য গরিব দুখীদের মধ্যে

বিতরণ করে দিলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্য হবে না" (মিশকাত)। একবার এক মজুদদার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হলে নবীজী (দ) ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, "এতে আগুন লাগিয়ে দাও।" তাছাড়া ওজনে কম দেয়া, প্রতারণা করা, ভালো মাল দেখিয়ে খারাপ মাল বিক্রি করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। কিন্তু সৎ ব্যবসা ও দায়িত্বনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ইসলাম অত্যন্ত সুসংবাদ দান করেছে। হযরত আবু সাইদ খুদরী রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "সৎ ব্যবসায়ীরা কেয়ামতের দিন সিদ্দীক ও নবীদের সাথে উঠবে" (তিরমিজি)। তিনি আরো বলেন, "শরিয়তের আদেশ নিষেধ মেনে চললে ব্যবসায়ীদের আয় সর্বাধিক হালাল।" আমাদের প্রিয় নবী (দ) ও তাঁর ন্যায়নিষ্ঠ সাহাবারা রোজায় ইফতার করতেন সামান্য খেজুর ও বিশুদ্ধ পানীয় দিয়ে। মূলত, সংযমবৃত্তি দেখা যায় এখানে। ইফতার-সাহরির নামে ভোজন উৎসবে মেতে থাকা রোজাদারের লক্ষ্য হতে পারে না। সবাই সংযমী হলে দুর্ভোগ-দুর্দশার পথ রুদ্ধ হবেই। ফিরে আসবে শান্তি-স্বস্তি। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে মাহে রমজানে সংযম সাধনার শিক্ষায় উজ্জীবিত করুন। সবক্ষেত্রেই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে চলে ইসলাম নির্দেশিত কল্যাণমূলক গণবান্ধব ব্যবসানীতি উপলব্ধির তৌফিক দিন।

জাকাত : সঠিক পন্থায় গরিবের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে : দারিদ্র্য বিমোচনে ভারসাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচি জাকাত। মাহে রমজানে জাকাত আদায় করতে হবে এমন সুনির্দিষ্ট তাগাদা ইসলামে না থাকলেও এ মাসে অধিক পুণ্যের ও ফজিলতের আশায় সামর্থ্যবান রোজাদাররা রোজার দিনে জাকাত আদায়ে সচেষ্ট হন। এ মাসে একটি ভাল কাজের সওয়াব বা প্রতিদান যেহেতু সত্তর গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে আল্লাহর করুণাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়- তাই রমজান মাসে জাকাত প্রদানের প্রচলিত নিয়মটি অবশ্যই যৌক্তিক ও ইতিবাচক। পবিত্র কুরআনে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে প্রায় পৌনে একশত বার নামাজের সাথে সাথে জাকাত প্রদানের জোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। "আক্বীমুস সালাত ওয়াতুজ জাকাত"- তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত আদায় করো। নামাজের মতোই জাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক ফরজ ইবাদতরূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নামাজ যেভাবে নিজ উদ্যোগে নিজের উপকারের জন্য আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে ফরজজ্ঞানরূপে মানুষ আদায় করে ঠিক অনুরূপভাবে জাকাত যার ওপর ফরজ হয়েছে সে নিজ তাগিদে স্বউদ্যোগী হয়েই কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হবে এই তো ইসলামের দিক নির্দেশনা। গরিবের দিকে চেয়ে রমজানে জাকাত বিতরণ যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক। যেহেতু গরিব দুস্থ মানুষেরাও এ মাসে রোজা-ঈদ উদযাপনে শামিল হতে চায়। যদিও এদের আর্থিক সঙ্গতি ও সচ্ছলতা নেই। তাই গরিবরা যাতে রোজার মাসটি নিশ্চিন্তে শান্তিতে সচ্ছলতার সাথে খেয়ে পরে পার করতে পারে- এজন্য রোজার শুরুর দিকে হিসাব করে ধনীদের জাকাত প্রদানে মনোনিবেশ করতে হবে। দেরিতে জাকাত দেওয়া মানে গরিবকে কষ্টে রাখা, তাদের অস্থিরতা-অসহায়ত্ব দেখেও চুপ থাকা। এটা অমানবিক। এ কারণেই রোজার শেষের দিকে জাকাত বিতরণের যে রীতি তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জাকাত সঠিকভাবে প্রদান ধনীদের ওপর ধর্মীয় ফরজ কর্তব্য হলেও এদিকে অনেক ধনীর দৃষ্টিপাত নেই। ঠিকভাবে জাকাত বিতরণে আগ্রহ ও সহানুভূতি যতটা থাকা দরকার ততটা চোখে পড়ে না। এটা দুর্ভাগ্যজনক। ঐশী দায়িত্ব পালনে উদাসীনতা প্রদর্শন দুঃখজনক। ধনীদের মধ্যে জাকাত বিতরণের নিষ্ঠুর পদ্ধতি দেখতে দেখতে বিরক্ত গরিবরা।

মাহে রমজান এলে জাকাত পাওয়ার আনন্দের মাঝেও গরিবদের অনেকেই ভয়ে শংকায় থাকেন। না জানি জাকাত নিতে গিয়ে প্রাণটুকু বিসর্জন দিতে হয়- এজন্যই যত শংকা। জাকাত গ্রহণের যুদ্ধে নেমে প্রতি বছর বহু লোকের প্রাণহানি ও হতাহতের খবর রমজানের শেষ দিনগুলোতে সংবাদপত্রে অহরহ চোখে পড়ে। বিগত দিনে এ ধরনের মর্মান্তিক খবর দেখে সবাই বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হলেও কিভাবে জাকাতের নামে গরিবদের জন্য মৃত্যুফাঁদ পাতা বন্ধ করা যায় তা সরকার বা বিত্তবান কোন পক্ষই ভাববার গরজবোধ করছে না। জাকাতদাতাদের উদাসীনতা ও প্রদর্শনীর যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বছর বছর গরিব লোকগুলোর জীবন বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কারো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ভাবখানা এমন, গরিবরা মরবে বাঁচবে তাতে কী আসে যায়! ওরা তো নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তাদের নিয়ে এতো ভাবতে হবে কেন? গরিব জনগোষ্ঠীর প্রতি এই যে উপহাস ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন তা কতো অমানবিক ও নৃশংসতার পরিচয় কখনো ওরা ভেবে দেখেছেন কী? মহানবী (দ) বলেছেন, "আযজাকাতু কিনতারাতুল ইসলাম" জাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন। জাকাত আদায়ের দ্বারা বিত্তবানরা নিঃস্ব মানুষের কাছাকাছি অবস্থান তৈরি করে। পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি জাগ্রত হয় জাকাতের মাধ্যমে। অথচ আমরা চারপাশে যা দেখছি তা হাদিসের শিক্ষার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কুরআন মজিদের সূরা তাওবার ১১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "ওয়াতুজ জাকাত ফাইখ্ওয়ানুকুম ফিদ্দীন"- ওরা জাকাত দেয়ার নীতি গ্রহণ করলে ওরা তোমাদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে। এখানে বলা হয়েছে জাকাত আদায় ও গ্রহণের মাধ্যমে ধনী-গরিবের দূরত্ব ঘুচে গিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো ঘটছে। জাকাত দেওয়ার ঘোষণা মাইকে প্রচার করে হাজারো অভাবী মানুষকে ঘরের আঙিনায় জড়ো করে ওদের মধ্যে ঠেলাঠেলি মারামারি লাগিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সবক কতটুকু পালন করা হচ্ছে তাই আজ ভেবে দেখার বিষয়।

এই ফরজ কাজ আদায়ে বিত্তবানদের বাহাদুরি অপ্রত্যাশিত। প্রদর্শনীর চিন্তা বাদ দিয়ে যথাযথভাবে জাকাত আদায়ে ধনীরা সচেষ্ট হবে এটাই ধর্মীয় নির্দেশনা। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়ার কাউকে সন্তুষ্ট করবে বা প্রশংসিত হবে এই প্রবণতা নামাজের ক্ষেত্রে না থাকলেও নামাজের মতোই আরেকটি ফরজ ইবাদত জাকাত আদায় করতে গিয়ে আত্মম্ভরিতা বা লৌকিকতা প্রদর্শন মোটেই ইসলামের শিক্ষা নয়। নামাজের আজান শুনে নামাজি নিজ উদ্যোগেই মসজিদে ছুটে যায় নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে। অথচ যার ওপর জাকাত দেওয়া ফরজ হলো সে জাকাত আদায়ে মোটেই তৎপর নয়, উদ্যোগী নয়- তাতো আল্লাহর আদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, জঘন্য পাপ। ইচ্ছাকৃত নামাজ পরিত্যাগ করার দায়ে যেমন আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে-জাকাত আদায়ে গড়িমসি বা অবহেলা করলে তাতেও রেহাই মিলবে না। নিজের নামাজ অন্যকে দিয়ে আদায় করা যায় না, নিজেকেই পড়ে নিতে হয়। জাকাতের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। জাকাত ফরজ হলে নিজে উদ্যোগী ও তৎপর হয়ে গরিব ও হকদার খুঁজে খুঁজে জাকাত প্রদানে মনোনিবেশ করতে হবে। কোন অবস্থায় গরিবদের ডেকে নিজের আশপাশে ঘুরঘুর করতে বাধ্য করা যাবে না। ঢাকঢোল পিটিয়ে জাকাত বন্টনের প্রশ্নই তো আসে না। এভাবে জাকাত দেওয়ার ফলে অভাবী লোকদের হুড়োহুড়িতে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে প্রতি বছর। মনে রাখতে হবে জাকাত প্রদর্শনীর বিষয় নয়; আল্লাহর হুকুম। গরিবের প্রতি ধনীদের নিছক দয়া বা করুণা নয়- এটা

গরিবের প্রাপ্য অধিকার। গরিবের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে অর্জিত ধন সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধির সুযোগ ধনীদেরই লুফে নিতে হবে। কেননা আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন- "ওয়াফি আমওয়ালিহিম হক্কুল লিস্সায়িলি ওয়াল মাহরুম" (সূরা জারিয়াত-১৯) অর্থাৎ ধনীদের ধন সম্পদে সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হক বা অধিকার রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকের জন্য। তাই গরিবের প্রাপ্য অধিকার সসম্মানেই তাকে পচ্ছিত করে দেয়া সবার কর্তব্য। তাদের অহেতুক হয়রানি করা ও জাকাত বণ্টনের কথা বলে মৃত্যুফাঁদে পেতে রাখা কোনভাবেই সমীচীন নয়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও সুবিধা সৃষ্টি না করে চলমান জাকাত বণ্টন প্রথা এখনই থামাতে হবে।

আজ মাহে রমজানের দ্বিতীয় জুমা। মসজিদে মসজিদে ইমাম-খতিব সাহেবরা জাকাত প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে বক্তব্য দেবেন, প্রচলিত জাকাত প্রদানের রীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ার তাগিদ দেবেন এ বিনীত প্রত্যাশা তাঁদের প্রতি। সপ্তাহে জুমার দিনে মানুষের বড় সম্মিলনে ইসলামের গণমুখী আদেশ-নির্দেশনা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হলে বহু বিষয়ে প্রত্যাশিত সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে। ধর্মপ্রাণ মানুষকে সঠিক ধর্মাচারে ও কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনের পথে ধাবিত করতে মসজিদগুলোকে সংশোধন কেন্দ্রের আদলে গড়ে তুলতে হবে। ইমাম-খতিবদের এক্ষেত্রে দায়িত্বনিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। না হয় ধর্মাচারের নামে বিকৃতি, বিভ্রান্তি বাড়তেই থাকবে।

ইবাদত গ্রহণযোগ্য করতে প্রিয়নবীর (দ) ওপর বেশি বেশি দুরূদ পড়ুন : ইবাদাত বন্দেগী কবুল বা গ্রহণযোগ্য করতে প্রিয় নবীজীর (দ) ওপর দুরূদ পাঠ করা জরুরি। দুরূদ শরিফ পাঠে আল্লাহ্র দরবারে ইবাদতের বিনিময় নিশ্চিত হয়। আল্লাহর কাছে সমুদয় ইবাদত-আরাধনা গ্রহণযোগ্য করতে ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসাপূর্ণ অন্তরে নিবিষ্টভাবে প্রিয়নবীর (দ) ওপর বেশি বেশি দুরূদ শরিফ পাঠ করা অতীব পুণ্যময় আমল। মাহে রমজানে প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের উচিত প্রিয়নবীর (দ) ওপর অধিক দুরূদ পাঠ করা। কারণ দুরূদ শরিফ পড়া এমন এক ইবাদত যা আল্লাহ্ অবশ্যই কবুল করেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সব সময় দুরূদ শরিফ পড়েন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- ইন্নাল্লাহা ওয়ামালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্ নাবী ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লিমু তাসলীমা- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবী করীম (দ) এর ওপর দুরূদ ও সালাম পেশ করে এবং তোমরাও নবীজীর (দ) ওপর দুরূদ পড়।' [আল কুরআন] এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র হাবীবের ওপর 'দুরূদ শরিফ পড়া ও সালাম পেশ করা' অতীব বরকতময় আমল। কেননা আল্লাহ্ পাক কোন কাজ করেন না কিন্তু তিনি তাঁর প্রিয় হাবীবের দুরূদ শরিফ পড়েন। দুরূদ শরিফ পাঠ আল্লাহর কাছে এতই পছন্দের যে, নিজেও পড়েন এবং তাঁর বান্দাদেরকে দুরূদ শরিফ পড়ার হুকুম জারি করেন। সুতরাং যারা প্রিয়নবীর (দ) ওপর দুরূদ শরিফ পড়েন তাদের চেয়ে মহা সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে? তাই যুগে যুগে সকল ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ মুফাসসির মুহাদ্দিস, আউলিয়ায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ ও সত্যিকার মু'মিন মুসলমানরা নিজেদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দুরূদ শরিফ পঠন পাঠন ও লিখনীতে ব্যয় করেছেন। এতে প্রত্যেকেই দু'জাহানের কামিয়াবী অর্জন করেছেন। কুরআন হাদীসের আলোকে প্রিয়নবীর (দ) নানাগুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাঁদের লিখিত দুরূদ শরিফে। দুরূদ শরিফ পাঠের ফজীলত বর্ণনাতীত। সংক্ষেপে কুরআন ও হাদীস শরিফের আলোকে এতটুকুই বলা যায় 'যে ব্যক্তি প্রিয়নবীর (দ) ওপর মাত্র একবার দুরূদ শরিফ পড়বে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। এবং কমপক্ষে তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন, তার আমলনামায় দশটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং আল্লাহ্র দরবারে তার মর্যাদা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। (আল হাদিস)। হাদীস শরিফে আছে 'কোন দোয়াই আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না যতক্ষণ না সে দু'আর আগে ও পরে প্রিয়নবীর (দ) ওপর দরুদ শরিফ পড়া না হয়।' হাদীসে পাকে আরো বর্ণিত আছে 'যে ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শুনার পর তার ওপর দুরূদ শরিফ পড়ে না সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কৃপণ। তার ধ্বংসের জন্য জিব্রাইল আলাইহিস সালাম দোয়া করেন।' (আল হাদীস)।

বহুভাবে দুরূদ শরিফ পড়া যায়। তবে উল্লেখযোগ্য ও ফজিলতপূর্ণ দুরূদ শরীফ হচ্ছে- আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম। রিযিক ও আয়ু বৃদ্ধি, ইহ ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি ও পরিত্রাণের আশায় বুজুর্গানে দ্বীন নিয়মিতভাবে দুরূদে তাজ, দুরূদে হাজারি, দুরূদে লাখী, দুরূদে মুকাদ্দাস এবং দুরূদে ফুতুহাত বেশি বেশি পড়তেন বলে বিভিন্ন কিতাবে দেখা যায়। আমাদের জীবন দুর্ভোগে কষ্টে ভরা। অভাব অনটন অনেকের নিত্য সঙ্গী। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে খালেছ অন্তরে বর্ণিত বিভিন্ন দুরূদ শরিফ পাঠে আমরা আল্লাহ্র করুণা, দয়া এবং প্রিয় নবীর(দ) ভালোবাসা ও ফুতুহাত অর্জন করতে পারি। রিজিক বা রুজি-আয় বৃদ্ধিতে দুরূদে ফুতুহাত পাঠে অশেষ ফায়দা রয়েছে। তা হলো: বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা সাল্লে ওয়াসাল্লিম আলা সাইয়েদেনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বিয়াদাদি আন্ওয়ায়ির রিজকি ওয়াল ফুতুহাত ইয়া বাসিতাল্লাযী ইয়াব সুতুর রিজ্কা লিমাই ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব। উবসুত্ আলাইনা রিজকাউ ওয়াসায়িআম্ মিন কুল্লি জিহাতিন মিন্ খাজাইনে গাইবিকা বিগাইর্ মিন্নাতিম মাখলুকিম বিমাহ্দিন ফাদলিকা ওয়াকারামিকা বিগায়রি হিছাব। এভাবে আরো বহু দুরূদ শরিফ বিভিন্ন অজিফা-কিতাবে রয়েছে। সংগ্রহ করে তা নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করে যেতে হবে।

মানবজাতির করুণার উৎসস্থল প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জগতকে আলোময় ও মানবমণ্ডলীকে ধন্য করার ঐশী যে কর্মসূচি তার প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রিয়নবীর (দ) নুরানী সত্তাকে সৃষ্টি। তাঁর আবির্ভাবও ঘটেছে মানবজাতির ঘোর দুর্দিনে, চরম বিপর্যস্ত মুহূর্তে। তমসাচ্ছন্ন যুগের আরবের অন্ধকার তাড়িত মানুষেরা প্রিয় নবীর (দ) আবির্ভাবের ছোঁয়ায় স্পন্দিত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠল। নারী-পুরুষ-শিশুসহ সবাই ফিরে পেলো বেঁচে থাকার প্রেরণা ও অধিকার। এমনকি পশু-পাখিসহ জগতের সকল সৃষ্টির করুণার মূর্ত প্রতীকরূপে প্রেরিত হন প্রিয়নবী (দ)। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদে প্রিয়নবীর (দ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন- অর্থাৎ হে রাসূল! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগতের করুণাসিন্ধু হিসেবে। তাই, প্রিয়নবী (দ) হচ্ছেন মানবতার করুণাধারা ও আল্লাহ্র রহমতের কেন্দ্রবিন্দু। দুনিয়ায় এতো পাপাচার, অনাচার, হানাহানি ও জুলুম-নিপীড়নে মানুষের সম্পৃক্ততা সত্ত্বেও শুধু প্রিয় নবীর (দ) কারণেই এখনো আল্লাহ্র রহমতের প্রস্রবণ অবারিত রয়েছে। নবীজীর (দ) এ ধরায় শুভাগমন ও উপস্থিতির সুবাদে আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ায় সমগ্র মানবতা ধন্য হচ্ছে জগৎ জুড়ে। কুরআনে পাকে একথা সত্যায়িত ও গুরুত্বের সাথে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক বলছেন, 'ওয়ামা কানাল্লাহু

লিয়ুআজ্জিবাহুম ওয়ানতা ফীহিম' অর্থাৎ হে রাসূল! "আপনি যাদের মধ্যে আছেন (যে জগৎ ও মানুষদের বেষ্টন করে রেখেছেন) তাদের ওপর গজব বা শাস্তি দেওয়া আমি আল্লাহ সমীচীন মনে করছি না"। উক্ত দুটি কুরআনে পাকের আয়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, জগতে আল্লাহর রহমতের উসিলা যেমন আমাদের প্রিয় নবী (দ), তেমনি পাপাচার-অনাচারে ডুবে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কঠিন শাস্তি বা গজব থেকে নিস্কৃতি মিলছে স্বয়ং নবীজীর (দ) কারণে। এজন্যে উম্মতকে সবসময় প্রিয়নবীর (দ) মেহেরবানীর কথা স্মরণ, কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে বেশি বেশি দুরূদ শরিফ পাঠে সচেষ্ট হতে হবে। ইবাদত-বন্দেগিকালে যখনই সুযোগ হয় তাঁর ওপর সালাত-সালাম, মিলাদ-কিয়ামের হাদিয়া বখশিশ করতে হবে। মাহে রমজানে প্রতিদিনের নামাজি তারাবিহ শেষে সংক্ষিপ্ত আয়োজনে হলেও নবীজীর (দ) ওপর সালাত-সালাম পেশ করার উদ্যোগ নেয়া হলে আল্লাহর রহমত ও প্রিয় নবীর (দ.)সন্তুষ্টি অর্জিত হবে এ আশা পোষণ করা যায়। আল্লাহ্ পাক মাহে রমজানে আমাদের বেশি বেশি দুরূদ শরিফ পাঠে শান্তি-সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করার সুযোগ দিন।

আল্লাহর অনুগ্রহ ধন্য হওয়ার সুযোগ ই'তেকাফ : মাহে রমজানের মাগফেরাতের দশ দিন পর আসে মুক্তির সওগাত নিয়ে নাজাতের দশক। এই দশ দিনেই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, অনুকম্পা, ক্ষমা ও করুণার আশায় মসজিদে মসজিদে পালন করা হয় ই'তিকাফ। যারা ই'তিকাফ আদায় করবেন আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া ভাল। রোজাদার মুসল্লিরা ই'তিকাফ আদায় করে বিশেষ ফজিলত ও পুণ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকেন। মাহে রমজানের প্রতিটি লিনক্ষণ ও মুহূর্ত খুবই দামি ও মূল্যবান। ইবাদত তপস্যা ও আরাধনার মাধ্যমে রোজাদার আল্লাহর দরবারে নিজেকে নিবেদন করতে সক্ষম হলে তবে জীবন হবে ধন্য ও কামিয়াব। বছরে একটি মাস মহিমান্বিত মাহে রমজানে সিয়াম সাধনা, ইবাদত-আরাধনা, দান-সদকাহ ও যাকাত-ফিতরার মাধ্যমে রোজাদারকে আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যের কাছাকাছি নিয়ে যায়। তেমনিভাবে মাহে রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ পালনের সুযোগ গ্রহণ করলে রোজাদারের মর্যাদা বাড়ে ও পুণ্যের থলি ভরে যায়। ই'তিকাফ এর শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা, কোন বস্তুর ওপর স্থায়ীভাবে থাকা। ই'তিকাফের মাধ্যমে নিজের সত্তাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয় এবং নিজেকে মসজিদ থেকে বের হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। ই'তিকাফ মাহে রমজানের একটি বিশেষ ইবাদত। শরীয়তের পরিভাষায় ই'তিকাফের নিয়তে পুরুষের মসজিদে অবস্থান করা অথবা কোন মহিলার নিজ ঘরে নামাজের স্থানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। আগেভাগেই ই'তিকাফের প্রস্তুতি নেয়া দরকার। ২০ রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব হতে মসজিদে মসজিদে মুসল্লিরা ই'তিকাফের নিয়তে প্রবেশ করবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সময় মসজিদে পূর্ণাঙ্গ অবস্থান করার মাধ্যমে মুসল্লীরা ই'তিকাফের নিয়তে সর্বক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত তসবিহ-তাহলিল, জিকিরে ব্যস্ত সময় কাটায়। যিনি ই'তিকাফ করেন তাকে মু'তাকিফ বলা চলে। ই'তিকাফ যে কোন সময় করা যায়। যখনই কেউ ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করেন তখনই তা ই'তিকাফ বলে গণ্য হবে। তবে ২০ রমজানের সূর্যাস্তের পূর্ব হতে শাওয়াল তথা ঈদের চাঁদ উদয় হওয়া পর্যন্ত ই'তিকাফ পালন করা সুন্নাত। ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সব রকম ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে একমাত্র তাঁরই ইবাদতে নিবেদিত হয়ে পরিশুদ্ধি অর্জন। মাজহাবের ইমামদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মাহে রমজানের শেষ দশকে ই'তিকাফ পালন করা সুন্নাত। আমাদের হানাফী মাজহাব মতে রমজান শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ হচ্ছে সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া। অর্থাৎ মসজিদের মুসল্লিদের পক্ষ হতে বা মহল্লার মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তি ই'তিকাফ করলে তা সকল মুসল্লি বা মহল্লাবাসীর পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, মসজিদের মহল্লায় যিনি ই'তিকাফ আদায় করবেন তাঁর সাহুরি ও ইফতারের আয়োজন মহল্লাবাসীকেই করতে হবে। কেননা, সবার পক্ষ থেকে এবং সবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মসজিদে এক বা একাধিক লোক ই'তিকাফ পালন করে থাকে। তাঁরা মহল্লাবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেন বিধায় ই'তিকাফের সময়কালে তাঁদের খানাপিনার দায়িত্ব গ্রহণ ও খোঁজখবর নেয়া মহল্লাবাসীর ইমানী দায়িত্ব।

আত্মশুদ্ধি, আত্মার পবিত্রতা অর্জন, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধন এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভই ই'তিকাফের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া রমজানের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম একটি মর্যাদাবান রাতের (শবে ক্বদর) সন্ধান করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ই'তিকাফের দ্বারা অশেষ বরকত রহমত ও পুণ্য অর্জিত হয়। পার্থিব যাবতীয় চিন্তা ও ঝামেলা মুক্ত হয়ে ই'তিকাফ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ বাতিলের মোকাবেলায় আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চেতনা, প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে। ই'তিকাফের মাধ্যমে অন্তরকে দুনিয়াবি বৈষয়িক চাওয়া পাওয়া ও কামনা থেকে মুক্ত রাখা হয়, নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হয়, আল্লাহর ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রাখা হয় এবং আল্লাহর ঘরে নিজেকে সবসময় আটকিয়ে রাখা হয়। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের সঙ্গে নিজেকে স্থায়ীভাবে সম্পৃক্ত করে রাখে যেন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা ও মুক্তির দৌলত দান করেন। ই'তিকাফ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আমল যদি তা একনিষ্ঠতার সঙ্গে হয়ে থাকে। (বাহরুর রায়েক ২য় খণ্ড)।

ই'তিকাফ অতীব ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। মহাত্মা নবী-রাসূল ও আল্লাহর খাছ বান্দা আউলিয়ায়ে কেরাম ই'তিকাফ পালনে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। এর মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা, সম্মান ও আল্লাহর কাছে অতীব প্রিয়তর হওয়ার সুযোগ তারা হাতছাড়া করেন না। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, নবী করীম (দ) সব সময় মাহে রমজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। ওফাত পর্যন্ত এ নিয়ম তিনি পালন করেছেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফের সিলসিলা জারি রাখেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

গৃহকর্মী ও শ্রমজীবীদের প্রতি নিষ্ঠুরতাকে 'না' বলুন : মাহে রমজানে সংযম, সহনশীলতা, দয়া, সহানভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার ঐশী নির্দেশনা রয়েছে মানুষের জন্য। একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যবোধে উজ্জীবিত হওয়ার মাস পবিত্র রমজান। এ মাসে শ্রমিক-কর্মচারীদের থেকে কাজের বোঝা কমিয়ে দেয়ার জোর তাগিদ দিয়েছেন মানবতার দিশারী মহানবী (দ.)। সারা দিন রোজা রেখে কঠিন পরিশ্রমের কাজ পরিপূর্ণভাবে করা যে কতোটা দুঃসহ-দুঃসাধ্য তা হাড়ে হাড়ে টের পায় ধনী রোজাদাররা। শ্রমিকের কষ্টের দিনলিপি ও নিত্য জীবনযন্ত্রণা রোজার উপবাসব্রতের মধ্যে ধনীরা কিছুটা হয়তো অনুভব করতে পারে। দুঃখজনক যে, তবুও ধনিক শ্রেণী-মালিক গোষ্ঠীর পরিবের প্রতি তেমন সহানুভূতি দেখা যায় না। যন্ত্রণাকাতর শ্রমিকের কষ্ট দেখেও বেমালুম ভুলে থাকার বহু দৃষ্টান্ত রোজার মাসেও লক্ষ্য করা যায়।

মালিকপক্ষ শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ না করেই শুধু রোজা রাখতে যেখানে ব্যাপক জঠর জ্বালায় কাহিল হয়ে পড়েন সেখানে খেটে

খাওয়া পরিশ্রমী মানুষ কতো কষ্টে যে রোজা রাখছে– নিঃসন্দেহে তারা এটা উপলব্ধি করতে পারেন বলেই ধরে নেয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের দৈহিক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেসব শ্রমিক রুজি-রোজগার বা আয় উপার্জন করে, মালিক পক্ষকে শ্রমিক শ্রেণীর এই কষ্টসহিষ্ণু জীবনযাত্রা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। মাহে রমজানে শ্রমিক, অধীনস্থ কাজের লোক ও পরিবার-গৃহস্থলির কাজে নিয়োজিত সকল শ্রমজীবীদের প্রতি সুদৃষ্টি–সহানুভূতি প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয় নবী (দ.)। কারণ এটা স্বাভাবিক যে, যারা বিভিন্ন শ্রমসাধ্য কাজে বাসা বাড়ি বা মিল কারখানায় নিয়োজিত- রোজা রেখে অধিক পরিশ্রম করলে তারা অধিক ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। এমনকি তারা কাজের ভারে-চাপে শারীরিক-মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তাই মাহে রমজানে কাজের লোক, শ্রমিক শ্রেণী ও অধীনস্থ লোকদের কাজের ভার হালকা ও সহনীয় পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলেছেন আমাদের প্রিয় নবী (দ.)। ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানুষের জন্য সাধ্যাতীত এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুযোগ-সুবিধা ও অক্ষমতাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সবার অধিকার, সকলের শান্তি-স্বস্তি-তৃপ্তি-অতৃপ্তির দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হয়েছে ইসলামী জীবনদর্শনে। কেউ কাকে জুলুম না করার, শোষণ-নিপীড়নের পথ থেকে দূরে থাকার জন্যে মানবতাকে চিরকাল দিশা দিয়ে যাচ্ছে ইসলাম। অন্যের দুঃখ-মর্মবেদনা, জীবন যন্ত্রণা দেখেও চুপ না থেকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা দেখানোর তাগাদা দেয়া হয়েছে কুরআন-হাদিসে ও নানা ইসলামী গ্রন্থে।

পবিত্র কুরআন হাদিস, নবী-রাসুল ও আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন মিশনই হলো বিপন্ন-দুর্দশাগ্রস্ত মানবতাকে তুলে আনা। মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের পক্ষে সবসময় সরব-সোচ্চার আমাদের প্রিয় নবী (দ.)। তাঁরই ওপর অবতীর্ণ কুরআন মজিদের সকল নির্দেশনাও মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরে। কুরআন নবী, দ্বীন ধর্ম মানলে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও নিষ্ঠুরতা নয়; উদারতা ও মানবিক আচরণেই অভ্যস্ত হতে হবে। তারাও যে মানুষ, শ্রমজীবীরাও যে খেয়ে পরে নিশ্চিন্তে শান্তিতে-স্বস্তিতে দিন কাটাতে চায়, এটা তাদের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন– এই বোধ ও অনুভূতিটুকু থাকতে হবে বিত্তবান মালিকদের। কোনো অবস্থাতেই তাদের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাই, গৃহকর্মী ও শ্রমজীবীদের প্রতি নিষ্ঠুরতাকে অন্তত এ মাসে 'না' বলুন।

রোজাকে পরিপূর্ণ করতে নিয়ম-পদ্ধতি মানা জরুরি : যে কোনো দায়িত্ব ও করণীয় সঠিকভাবে যথাশুদ্ধভাবে করায় নির্দিষ্ট কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলা জরুরি। নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্ত না মেনে যথাযথভাবে কোনো কিছুই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সঠিকভাবে রোজা রাখার জন্যে, রোজাকে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও পছন্দনীয় করতে শরিয়তের দিক নির্দেশনা জানা, বুঝা ও সে মতে আমল করা অতীব জরুরি। নিয়ম-পদ্ধতি না মেনে, কায়দা-কানুন না বুঝে ইচ্ছেমতো খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য দিয়ে রোজা রাখায় কোনো ফায়দা নেই। স্বেচ্ছাচারিতায় ও নিয়ম-কানুন লংঘনের দ্বারা রোজার ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবার পূর্ণ আশংকা থেকে যায়। তাই, রোজা যার ওপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য তাকে রোজার মাসআলা-মাসায়েল (নিয়ম-পদ্ধতি) জেনে নেওয়াও ফরজ হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ রোজাদারকে রোজার সমস্ত শর্ত করণীয় জানতে হবে। এখানে গাফলতি বা উদাসীন হয়ে থাকা মানে নিজের অজান্তেই রোজাকে অন্তঃসারশূন্য শুধুই উপবাসের পর্যায়ে নামিয়ে আনা। রোজার মাহাত্ম্য অর্জনে, আত্মার প্রশান্তি মেটাতে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাতে তাই যথাশুদ্ধভাবে রোজা রাখায় সচেষ্ট হতে হবে সর্বস্তরের রোজাদারকে। সতর্ক থাকতে হবে, সামান্য উদাসীনতায় রোজা যেন নষ্ট না হয়, ছুটে না যায় যেন একটি রোজাও– তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই এদিকে।

রমজান মাসে রোজা রাখা সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ– 'ফামান শাহিদা মিনকুমুশ্ শাহ্‌রা ফাল্ ইয়াসুমহু'– অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোজার মাসটি পাবে, তারই কর্তব্য হচ্ছে রোজা রাখা। [সূরা বাক্বারা : ১৮৫] আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনা শরিফে হিজরতের [জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে যাওয়া] আঠার মাসের মাথায় শা'বান মাসে রোজা ফরজ হওয়ার এই বিধান অবতীর্ণ হয়। এজন্যে রমজান মাসের রোজা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমান জাতির জন্য ফরজে আইন। অর্থাৎ ঐশী বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ও বিধান। রমজান মাসে পূর্ণ মাস একজন বালেগ [প্রাপ্ত বয়স্ক], সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর রোজা রাখা ফরজ। কুরআন-হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা রোজার বিধান প্রমাণিত। আল্লাহপাক কুরআন মজিদে বলেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর [সূরা বাক্বারা : ১৮৩]। আল্লাহর নির্দেশিত এ রোজার বিধানকে যে অস্বীকার করবে এবং শরিয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া যে রোজা রাখবে না, সে ফাসিক ও কবিরা গুনাহগার হবে (জঘন্য পাপী হিসেবে আল্লাহর কাছে ধিকৃত হবে)। মহানবীর (দ) হাদিস বা বাণী থেকেও রোজার ফরজ হওয়া প্রমাণিত। হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (দ) বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমজান মাস সমুপস্থিত। ইহা এক বরকতময় মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসের রোজা তোমাদের ওপর ফরজ করেছেন"। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রমজান মাসের রোজা রাখাকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়েছে। রোজার অতীব আবশ্যকতা তথা এ ফরজ বিধানকে গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে প্রিয় নবী (দ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো শরয়ি ওজর (যৌক্তিক অপারগতা) বা রোগ ব্যতীত রমজানের একটি রোজা ছেড়ে দেবে সে যদি পরবর্তীতে সারাজীবন ধরে রোজা রাখে তবুও তার ক্ষতিপূরণ হবে না। [হাদিসগ্রন্থ– আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদে– এ বর্ণনা রয়েছে]।

কারা, কোন্ অবস্থায় রোজার বাধ্যবাধকতা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পাবে কুরআন মজিদে এর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। সূরা বাক্বারার ১৮৩-১৮৪ আয়াতে আল্লাহর বাণী: "সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয়, তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎ কাজ করে এটা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন তথা রোজা রাখাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।" এই অতিশয় কষ্ট বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা জানা থাকা দরকার। তা হচ্ছে– এমন কষ্ট যা শরিয়তের দৃষ্টিতে ওজর (বাস্তব অপরাগতা) বলে গণ্য, যেমন অতি বার্ধক্য, চিরস্থায়ী রোগ ইত্যাদি। অনুরূপ রোজা রাখতে না পারায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান' মানে একদিনের রোজার পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দুই বেলা পেট ভরে খেতে দেওয়া। তাছাড়া, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বলতে বুঝাবে– যার রোগজনিত দুর্বলতা রয়েছে বলে রোজা রাখা অতীব কষ্টকর, তার জন্য ঐ মাসে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। পরে কাযা আদায় করলেই চলবে। তবে রোজা রাখায় প্রাণের আশংকা আছে, এ কথাটি কোনো মুত্তাকি ও অভিজ্ঞ

চিকিৎসককে বলতে হবে। সফরে রত ব্যক্তি রোজা রাখার সুযোগ না পেলে পরে ওই রোজা আদায় করবে। গর্ভবতী মহিলার যদি গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির আশংকা হয় অথবা স্তন্যদায়ী মা যদি রোজা রাখা তার নিজের বা তার স্তন্য পানকারী শিশুর ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সেও এই মাসে রোজা না রেখে পরে সুবিধামত সময়ে কাযা আদায় করতে পারে। ঋতুবতী মহিলা বা সন্তান প্রসবকারিনী নেফাছ থেকে পূর্ণ পবিত্র হওয়ার আগে রোজা রাখবে না। নাবালেগ বা যারা প্রাপ্ত বয়স্ক নয় তারা রোজা রাখার হুকুমের মধ্যে পড়ে না। অবশ্য খুশি মনে বালেগের কাছাকাছি বয়সে পৌঁছা কেউ রোজা রাখতে চাইলে তাল অভ্যাস রপ্ত করার জন্য তাকে বাধা না দেওয়া ভাল। কিন্তু জোর করে রোজা থাকতে বাধ্য করা যাবে না কোনো অক্ষম শিশুকে। কোনো মহিলা যদি রাতের বেলা হায়েজ-নেফাছ থেকে পবিত্র হয়ে থাকে, তবে পরদিনে তাকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। যদি পবিত্রতার গোসল নাও করে থাকে। গোসল ফরজ থাকা অবস্থায় সময়াভাবে গোসল করতে না পারলেও সাহরি খাওয়া যায়। তবে নামাজ আদায়ের জন্য অবশ্যই ফরজ গোসল করতে হবে। ভুলবশত পানাহারে রোজা ভঙ্গ হয় না। অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি কানে ঢুকলে তাতে রোজা নষ্ট হবে না। তবে গোসলের সময় গলায় পানি ঢুকলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এজন্য সাবধানতা খুবই জরুরি। ধূমপান ও ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমির জন্য রোজা নষ্ট হবে। অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলেও রোজা নষ্ট হবে না– যদি না তা পুনরায় গিলে ফেলে। রাত আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর (সূর্যোদয়ের আগে ঠিক দেড় ঘন্টা আগে থেকে সুবহে সাদিক শুরু) পানাহার ও যৌনাচারে রোজা ভঙ্গ হবে। আরো বহু নিয়ম রয়েছে, রোজাদারকে তা জেনে নিতে হবে।

বদর দিবস : জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াইয়ের মূল প্রেরণা : মাহে রমজান সত্যনিষ্ঠার চর্চা, অসত্যের-অন্যায়ের এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে পরিশুদ্ধ হবার মাস। সকল অন্যায় ও গর্হিত কর্মকান্ডের বিপরীতে সত্য ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রচেষ্টাই জিহাদ। সত্য সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় অবিরাম চেষ্টা করে যাওয়া এবং অন্যায়-অসত্য রুখতে সর্বোত সংগ্রাম হচ্ছে জিহাদ। কেবল নির্বিচারে ধরে ধরে কাফের খতম বা মানুষ হত্যা কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের দমনের নাম জিহাদ নয়; পৃথিবীতে মানবিক ঐক্য গড়া ও বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই জিহাদ। সত্য ও সুন্দরের পক্ষে আত্মনিবেদিত হয়ে শোষণ, নিপীড়ন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও জুলুমতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা বড় জিহাদ। আরবের আইয়ামে জাহেলিয়াতের নিকষ অন্ধকার থেকে মানুষের মুক্তির প্রয়োজনেই ইসলামের আবির্ভাব অনিবার্য ছিল। নানামুখী জুলুম নিষ্পেষণ ও মানবতাবিরোধী শক্তির দাপটে কলুষিত সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আলোর মশাল হাতে ইসলামের গোড়াপত্তন হয়। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় তখন জিহাদ পরিচালিত হয়। তেমনিভাবে হিজরি দ্বিতীয় সালের ১৭ রমজান (৬২৪ ঈসায়ী সালের ১৩ মার্চ) সংঘটিত হয়েছিল সত্য-অসত্যের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। মুসলমানদের বড় বিজয়ের দিন হিসেবে বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। দ্বীন প্রচার এবং আল্লাহ ও রাসুলের (দ) সন্তুষ্টি বিধানে বৈরী শক্তির হুমকি-হিংস্রতার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তখন সশস্ত্র জিহাদ প্রাসঙ্গিক ছিল মুসলমানদের কাছে। সত্য সুন্দর সাম্য প্রতিষ্ঠা ও মানবতাকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (দ) পক্ষ হতে এ জিহাদ মানবজাতির জন্য বড় ইহসানস্বরূপ। এক কথায় আল্লাহ ও রাসুলের (দ) প্রদত্ত বিধিবিধান সমাজের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববাসীর ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তির জন্য অবিরাম প্রচেষ্টার নামই জিহাদ। অন্যায় জুলুম ও অবৈধ আধিপত্য ঠেকাতেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মহানবীর (দ) মদীনা আগমনের পর ইসলামের পক্ষে সুদৃঢ় জনসমর্থন ও ইসলামের বহুমুখী সফলতা দেখে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত ও ধ্বংসে করার জন্য দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজানে আবু জেহেলের নেতৃত্বে বর্বর কুরাইশ দলপতিরা মদিনা অভিমুখে অভিযান চালায়। মদিনা উপকণ্ঠ হতে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসলামের শত্রুরা। মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র মুসলমানের বিপরীতে শত্রুদের সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। এক অসম ও কঠিন যুদ্ধে বীরদর্পে লড়াই করে মহান আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানরা বিজয় ছিনিয়ে আনে। এতে ইসলামের জয়যাত্রার পথ সুগম হয়। আজ ১৭ রমজান যারা বদর দিবস পালন করবে তাদেরকে এই সময়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে হবে। বিকৃতভাবে 'বদর যুদ্ধের' প্রাসঙ্গিকতা এখানে টেনে এনে গোলমাল বাধিয়ে দেওয়ার জামায়াতি কূটবুদ্ধির ব্যাপারে হক্কানি সত্যনিষ্ঠ আলেমদের সোচ্চার হতে হবে। এর প্রকৃত তাৎপর্য ও বাণী নির্মোহ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝাতে হবে আমজনতাকে। বলতে হবে যে, একটি প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসা মক্কার দাম্ভিক ও বিপথগামীদের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ মোকাবেলা করতেই মুসলমানরা নিরুপায় হয়ে এতে অংশগ্রহণ করে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরে কুরআনের বিধান চালু করার জন্য রাসুল (দ) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে ইকামতে দীনের কাজ করে যাচ্ছিলেন। মক্কী জীবনের ১৩টি বছর বিরুদ্ধবাদীদের নির্মম অত্যাচারের পরেও তিনি থেমে যাননি। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় দীর্ঘতম দুঃখের নিশির অবসান হয় এবং আল্লাহর নবী তাঁরই নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যান। সেখানে কুরআনের ছাঁচে গঠন করেন সর্বজাতির সহাবস্থানে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র। গড়ে তুলেন অসত্য, অন্যায়, শিরক, কুফর ও বাতিলের বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। কিন্তু মক্কার অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এ এক অসহনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। তারা এটা সহ্য করতে পারল না। তারা আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্ব কায়েমের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এ শিশু রাষ্ট্রের মূলেই কুঠারাঘাত করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। তারা মদিনার সীমান্তে বারবার নাশকতামূলক কার্যকলাপ, লুটতরাজ, সম্পদ বিনষ্ট করে একটি অস্বস্তিকর ও উত্তেজনাময় অবস্থার সৃষ্টি করতে লাগল। এমনকি তারা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র শুরু করে ও রণ সম্ভারে মজবুতি অর্জনে লেগে পড়ে। অতঃপর সে সিরিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। রাসুল (দ) এ সংবাদ পেয়ে মক্কা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিরিয়ার পথে 'বদর' নামক স্থানে ৮ই রমজান সোমবার রাতে সিয়াম পালনকারী তিন শতাধিক মর্দে মুজাহিদকে নিয়ে উপস্থিত হন। এ দিকে চতুর আবু সুফিয়ান মক্কার নবীদ্রোহীদেরকে মিথ্যা খবর রটিয়ে দিলো, তারা মুসলমানদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। তাই আবু জেহেলের নেতৃত্বে মক্কার এক হাজার বিরুদ্ধবাদী সৈন্যরা রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭ রমজান ভোর বেলা তারা মুসলমানদের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। রাসুল (দ) সিজদায়ে অবনত হয়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করলেন : 'হে আল্লাহ! আজ যদি এই মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে তোমার ইবাদত করার মতো এ পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না।' আল্লাহ এ প্রার্থনা কবুল করলেন এবং তিন হাজার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করলেন। রোজাদার মুসলিম মুজাহিদদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে

ইসলামের বিজয় পতাকা পৃথিবীর আকাশে উড্ডীন হয়েছিল আজকের এই দিবসে মাহে রমজানেই।

স্বদেশ স্বজাতির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র চক্রান্ত প্রতিরোধেই এ বদর যুদ্ধ জরুরি ছিল। তাই এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের অস্তিত্বের লড়াই। নিজেদের ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামের অপর নাম বদরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। ইসলামে আক্রান্ত হলেই যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কোনোভাবেই আগে আক্রমণ ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। অন্যায়ভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে তুচ্ছ বিষয়ে যুদ্ধ-সংঘাতে লিপ্ত হওয়া ইসলামের শিক্ষা নয়। যুদ্ধ বিগ্রহ মাড়িয়ে কোথাও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেবল সশস্ত্র যুদ্ধে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অথচ আজ দুনিয়াজুড়ে ইসলামের নামে কুচক্রীরা সশস্ত্র ও হিংস্র পন্থায় 'জিহাদ' শুরু করেছে। অথচ এভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে 'জিহাদ' বলার সুযোগ নেই। নিরীহ মানুষকে হত্যা ও সন্ত্রাসবাদ কখনো জিহাদ নয়। বহু ইসলামী দল ও সংগঠন প্রতিবছর 'বদর দিবস' পালনে নানা কর্মসূচি নেয়। বদরের চেতনা উনারা যেভাবে বুঝেন বা বুঝাতে চান তা আজকের প্রেক্ষাপটে কতটা জরুরি তা খোলাসা করা দরকার। নতুবা বাড়বে বিভ্রান্তি, লেগেই থাকবে সংঘাত। এখানে একটি বিষয় অস্পষ্ট রয়ে গেছে বদর দিবস বা জিহাদের আসল তাৎপর্য বা শিক্ষা কী? ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে প্রতিপক্ষ জনগোষ্ঠীকে ঘায়েল করা বা প্রতিহিংসা ছড়ানো যদি জিহাদ হয় তাতে ইসলাম সায় দেয় না। বরং দেশ ও সমাজে বিরাজিত পর্বতসম বৈষম্য, শোষণ-নিপীড়ন, দারিদ্র্য, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, সন্ত্রাস ও সর্বগ্রাসী অপরাধযজ্ঞ থেকে মানুষকে রক্ষার সংগ্রাম বা জিহাদ করাই আজকের প্রেক্ষাপটে বেশি প্রাসঙ্গিক এবং অতি জরুরি।

মহানবী (দ) কোনো একটি জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে যাওয়ার পথে সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বলেছেন- 'তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এলে।' তিনি আরো বলেন, 'বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছোট জিহাদ আর তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে কাফির রয়েছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই বড় জিহাদ।' মাহে রমজানে সংঘটিত বদরের যুদ্ধের শিক্ষা হলো দেশ ও সমাজে বিরাজিত যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে মানবিক জাগরণ সৃষ্টি করা এবং কুপ্রবৃত্তির দমনপূর্বক সুরিপুর উজ্জীবন ঘটানো। আত্মিক উৎকর্ষ এবং নৈতিক বোধের উজ্জীবনই বদর দিবসের আসল শিক্ষা।

২১ রমজান : আমিরুল মুমেনিন মাওলা আলী (রা)-এর শাহাদাত দিবস : খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা বেলায়তের সম্রাট আমিরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা) ২১ রমজান রোজা রাখা অবস্থায় কুফার মসজিদে নামাজ আদায়কালে পাপিষ্ঠ আবদুর রহমান বিন মুলজিমের তরবারির আঘাতে শহীদ হন। আহলে বায়াতে রাসূলের (দ) সদস্য মহান সাহাবী হযরত আলী (রা)-এর অতুলনীয় শান মর্যাদার ব্যাপারে (দ) বহু তাৎপর্যপূর্ণ বাণী রয়েছে। প্রিয় নবী (দ) বলেন, "হে খোদা, তুমি তার বন্ধু হও, যে আলীর বন্ধু; তুমি তার শত্রু হও যে তাঁর শত্রু।" প্রিয়নবী (দ) আরও বলেন, "আনা মদিনাতুল ইল্‌মে ওয়া আলীয়্যু বাবুহা, আমি রাসূল (দ) হলাম জ্ঞানের শহর এবং হযরত আলী (রা) হলেন তার দরজা।"

রোজার সমুদয় বিচ্যুতির নিষ্কৃতি 'সাদকাতুল ফিতর' : মাহে রমজানের মাগফেরাতের দিনগুলো ফুরিয়ে আসছে। নাজাতের দশক দোরগোড়ায়। মাহে রমজানের একটি করণীয়ও যেন ছুটে না যায় রোজাদারকে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। মাহে রমজানের মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও ইবাদত বন্দেগিতে মানুষের অংশগ্রহণের নানা নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারিত। অজ্ঞতা বা ভুলবশত রোজার নিয়ম-পদ্ধতির ব্যতিক্রম চর্চা যে কারো দ্বারা সংগঠিত হতেই পারে। ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় মানুষ ইসলাম চর্চা ও রোজা নামাজ আদায়ে যতোই ভুল-বিচ্যুতি করুক- তার দৃষ্টান্ত প্রতিকার কিন্তু শুধু শাস্তিই নির্ধারিত নয়। ভুল-বিচ্যুতির মার্জনা লাভের নানা উপায় সুনির্দিষ্টভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন উম্মতের করুণাধারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (দ)। উম্মত কিভাবে পরিত্রাণ চাইবে তা প্রিয় নবীজীকে(দ) কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। জীবন চলার পথে কৃত অপরাধ ও ভুল-বিচ্যুতির দায় এড়াতে পবিত্র কুরআনে অনুশোচনার ধরন ব্যক্ত হয়েছে এভাবেঃ রাবকানা জালামনা আন্ ফুসানা ওয়া ইন্ লাম তাগ্‌ফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসেরীন- 'হে প্রভু আমি নিজ আত্মার ওপর অবিচার করেছি, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তই থেকে যাবো' আল্লাহর কাছে এভাবে প্রার্থনা জানালে প্রত্যুত্তর আসে- ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম- 'বান্দারা নিশ্চয়ই জেনে রাখো তোমার প্রভু আল্লাহ্ তো অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' কুরআন মজিদের অন্য একটি আয়াতে মানুষের যাবতীয় অপরাধের নিষ্কৃতির অব্যর্থ দিক নির্দেশনা পেশ করে আল্লাহ্ পাক বলেন, ওয়ালাও আন্নাহুম ইজ্ জালামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্‌তাগফারুল্লাহা ওয়াস্ তাগ্‌ফারা লাহুমুর রাসূলু লাওয়াজাদুল্লাহা তাওয়াবার রাহিমা- 'তোমাদের কেউ যখন নিজের ওপর জুলুম করে বসবে তোমরা আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাইবে এবং প্রিয় রাসূলের(দ) শরণাপন্ন হবে, তিনি যদি তোমাদের ক্ষমা করেন তবে অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা রাখতে পার।' মাহে রমজানে পুণ্যের সুযোগ ও হাতছানি অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

আর এই রহমত মাগফেরাত ও নাজাতের মাসটিকে উদাসীনতা ও অবহেলায় কাটিয়ে দেওয়ার শাস্তিও খুবই মর্মন্তুদ। রোজা তারাবিহ্, সাহ্‌রি ইফতার, নামাজ প্রভৃতি ইবাদত বন্দেগি আমরা সঠিকভাবে পালন করেছি স্থিরচিত্তে তা বলা যাবে না। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছায় বহুভাবে আমাদের নানা দুর্বলতা ও ইবাদতে শৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছে।

রোজা নামাজের হুকুম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালনে আমরা হয়তো ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের কথাবার্তা, উঠা বসা, চলাফেরা ও জীবনাচারে রোজার দিনগুলোতে বহু অনিয়ম ও ভুল-বিচ্যুতি যে সংঘটিত হয়েছে তা তো ধরেই নিতে পারি। কিন্তু যখনই ভুল পথে পা বাড়িয়েছি, ইবাদত রিয়াজতে অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা আসায় পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়েছি, তখন আল্লাহর ঘোষিত ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় উন্মুখ থাকি আমরা। মাহে রমজানে আমাদের দ্বারা যতো অন্যায়, অপরাধ ও ভুল-বিচ্যুতি হয়েছে তার প্রতিবিধানে সচেষ্ট না হলে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি আমাদের পেতেই হবে। পাপের কারণে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির দুঃসংবাদে আমরা বিচলিত হই, অনুতপ্ত হই, কৃত অপরাধ থেকে মার্জনা কিভাবে সম্ভব তা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ি। এই হতাশা ও অনুশোচনা যতোই তীব্র হবে ততোই মঙ্গল। বলা হয়েছে 'আন্ নাদামাতু তাওবাতুন'- অনুশোচনাই হচ্ছে তাওবা। সচরাচর আমরা দেখি যে, ভুলের জন্য লজ্জিত অনুতপ্ত ও দুঃখবোধ করলে যে কেউ তাকে রেহাই দিতে পারে।

আর আল্লাহর কাছে অনুশোচনাই বেশি পছন্দনীয়। প্রিয় নবী(দ), আউলিয়া কেরামের উসিলায় যখন কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে কৃত পাপরাশির ক্ষমা চাওয়া হয় তখন আল্লাহ্ পাক বলেন- ইন্নাল্লাহা

তাওয়াবার রাহিমা- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মানুষের তাওবা গ্রহণে অতিশয় দয়ার্দ্র।' মাহে রমজানের শেষ মুহূর্তে এসে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে কৃত অপরাধ ও ভুলের প্রতিকার চাইতে হবে। নফুবা ইবাদত ও সিয়াম সাধনার ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে অপরাধীই হয়ে থাকতে হবে আমাদের।

রোজার ভুল-বিচ্যুতির দায় থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ পাক আমাদের সামনে সাদ্কাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় অত্যাবশ্যকীয় করেছেন। ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতঃ রাসূল(দ) জাকাতুল ফিতরকে রোজাদারের বেহুদা কথা ও কাজ এবং পাপ থেকে পবিত্র করা এবং নিঃস্ব অসহায় মিসকিনদের খাবারের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব করেছেন। যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করে সেটি আল্লাহ্র কাছে কবুল হয়। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাজের পর আদায় করে তা অন্যান্য দান সদকার মতো বিবেচিত হবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্, হাকেম)।

মনে রাখতে হবে সদ্কা-ফিত্রা গরিবের হক। তাই গরিবরা যাতে হাসিখুশিতে রোজা ও ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারে সেদিকেই দৃষ্টি রেখে জনপ্রতি ১০/২০ টাকা করে না দিয়ে একজনকে একটি ফিতরা কিংবা পুরো পরিবারের ফিতরা একজন গরিবকে প্রদান করা উত্তম। জাকাত-ফিতরা ইত্যাদি গরিববান্ধব কর্মসূচি দেয়া হয়েছে গরিবরা যাতে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে। তাই, জাকাত-ফিতরা এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে এই বছর যাকে জাকাত-ফিতরা দেওয়া হয়েছে আগামী বছর সে আর জাকাত নিতে আসবে না। জাকাত-ফিতরার টাকায় পরিবের ভাগ্য বদলে দিতে হবে।

অভাবী দুস্থদের নিয়ে ইফতারের আয়োজনে অশেষ কল্যাণ : দিন শেষে রোজাদারের শুষ্ক নিষ্প্রভ মুখে হাসি ফোটায় ইফতার। সূর্যাস্তের পর রোজাদারের রোজা ভঙ্গের যত আনন্দ ও উৎসব এই ইফতার ঘিরে। ইফতার শব্দের অর্থ বিরতি, ভঙ্গ করা। ইসলামী পরিভাষায় পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রোজা সমাপ্তির জন্য সান্ধ্যআহার গ্রহণই ইফতার। রোজা রেখে সময়মতো ইফতার করা ও অন্যকে ইফতার করানোয় রয়েছে অশেষ সওয়াব ও কল্যাণ। প্রিয়নবী (দ) বলেছেন, রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ মুহূর্ত রয়েছে। এর একটি হলো, তার ইফতারের সময় আর অন্যটি হল আলাহর সঙ্গে তার নিশ্চিত সাক্ষাত লাভের খুশি। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইফতার সূর্যাস্তের পরপরই করা উত্তম। অন্ধকার হওয়ার জন্য অপেক্ষায় থেকে দেরিতে ইফতার করা ঠিক নয়, মাকরূহ (আলাহর কাছে অপছন্দনীয়)। প্রিয়নবী (দ) সাহরি দেরিতে খাওয়া এবং ইফতার সূর্যাস্তের সঙ্গে দ্রুত সেরে ফেলার সুস্পষ্ট তাগিদ দিয়েছেন। আলাহর রাসূল (দ) বলেন, 'তোমরা ইফতারের সময় হলেই দ্রুত ইফতার করে নাও, বিলম্বে ইফতার করো না।' ইফতার সঠিক সময়ে করার নির্দেশনা দিয়ে প্রিয়নবী (দ) বলেন, 'ততদিন পর্যন্ত মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যত দিন তারা ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ইফতার করে নেবে।' (বুখারি ও মুসলিম শরিফে হাদিসটির বর্ণনা রয়েছে)। তবে সূর্যাস্ত হয়েছে কি-না এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলে ধারণার ওপর ইফতার করা যাবে না। সময়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে দেরি না করে তাড়াতাড়ি ইফতারি করাই ইসলামের হুকুম। আলাহর কাছে এটাই উত্তম আমল হিসেবে গণ্য। হাদিসে কুদসীতে মহান আলাহ পাক বলেন, আমার বান্দাহদের মধ্যে যারা সঠিক সময়ে ইফতার করে, তারাই আমার কাছে অধিকতর প্রিয়। নবী করিম (দ)-এর বাণীতেও দ্রুত ইফতার করার ফজিলত ব্যক্ত হয়েছে। নবীজী (দ) বলেন, 'আমি ওই লোককে বেশি ভালবাসি যে ইফতারের সময় হওয়া মাত্র দেরি না করে দ্রুত ইফতার করে নেয়'। (তিরমিজি হাদিসগ্রন্থে এ বর্ণনা রয়েছে)।

লাইলাতুল কদর: আল্লাহর করুণাধারা বইবে আজ জগদ্জুড়ে : মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিশুদ্ধ, পবিত্র এবং পাপমুক্ত করার কিছু দিনক্ষণ ও শুভ সময়, মুহূর্ত স্থির করে দিয়েছেন। পাপে তাপে অবক্ষয়ে নিমজ্জিত বান্দাদের পাপরাশির ভার হাল্কা করতেই মাহে রমজানে মহিমান্বিত লাইলাতুল কদর উপহার দিয়ে অপরিসীম করুণা ধারায় সিক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাবুল আলামিন। পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও মুক্তিদাতা মহান আল্লাহর রহমত ও করুণার বিশাল সিন্ধুতে ডুব দিয়ে পাপাগারে অভ্যস্ত মানুষ যাতে কৃত অপরাধের কারণে অনুশোচনার সুযোগ পায় সেজন্যই মুক্তির উপলক্ষ হিসেবে আমাদের মধ্যে লাইলাতুল কদর দান করেছেন মহান প্রভু। পৃথিবীতে নানা কারণে, অসৎসঙ্গ তাড়িত হয়ে, খেয়ালের ভুলে কিংবা স্বেচ্ছাচারিতার কারণে মানুষ খোদার বিধান অমান্য করে পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। স্খলন ও ভুল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

আল্লাহর বিধিবিধান সঠিকভাবে পালনে অনেকেই অভ্যস্ত হতে পারে না। ফলে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মানুষ নানাভাবে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। এভাবে বছর বছর ভুল ও অপরাধ প্রবণতার মাত্রা বাড়তে বাড়তে একপর্যায়ে মানুষ চরম পাপসাগরে হাবুডুবু খায়। আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির ভয়ে তখন সে বিচলিত, হতাশাগ্রস্ত ও নিরাশ হয়ে পড়ে। এ ধরনের বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা জেনে বা না জেনে নিজেদের ওপর জুলুম করে গ্লানি থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য লাইলাতুল কদর এক বিরাট সুযোগের হাতছানি। আল্লাহ্ পাক অপরাধবোধে জীত ও অনুশোচনাকারী বান্দাদের আশ্বস্ত করে পবিত্র কুরআনে অভয়বাণী দিচ্ছেন– 'হে বান্দারা তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না।' যারা কায়মনোবাক্যে কৃত অপরাধ স্বীকার করে আজ লাইলাতুল কদর রজনীতে আল্লাহকে ডাকবে তারা ক্ষমা ও মুক্তির আশা অবশ্যই করতে পারেন। কেননা, এদের মুক্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে আল্লাহ বারবার বলেছেন– 'ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রাহিম'। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তবে দয়া ও অনুগ্রহ এমনিতেই পাওয়া যায় না। আল্লাহর কাছে রহমত ও নাজাতের জন্য দুহাত তুলে ফরিয়াদ তো করতেই হবে। আর মানুষের ফরিয়াদ, আর্জি ও আকুতি খুব বেশি করে আল্লাহর দরবারে মকবুল ও গ্রহণীয় হওয়ার মুহূর্ত লাইলাতুল কদর।

লাইলাতুল কদর মানে সৌভাগ্য রজনী। এ মহিমান্বিত রজনীকে লাইলাতুল কদর নামে অভিহিত করার তাৎপর্য কী? এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিম শরিফের টীকাকার ইমাম নববী (র.) লিখেছেন, এ রাতের নাম লাইলাতুল কদর এ জন্যই রাখা হয়েছে যে, কদর মানে তাকদির ভাগ্য। আর এ রাতে মানুষের পরবর্তী এক বছরের তাকদির বা ভাগ্য রিজিক, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি কর্তব্যরত ফেরেশতাদের কাছে ন্যস্ত করা হয়। এর আরেক ব্যাখ্যা হলো– কদর মানে সম্মান ও মর্যাদা। আর যেহেতু এ রাতের সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি তাই এ রাতকে 'লাইলাতুল কদর' বলা হয়। (মুসলিম)।

পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য গুরুত্বের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। কুরআন মজিদে লাইলাতুল কদরের ফজিলত সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূর্ণ সুরা রয়েছে। সুরাটির নাম 'সুরা আল কদর'। সুরাটি ইরশাদ হয়েছে : 'আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদর– মহিমান্বিত রজনীতে। আর

মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে আপনি জানেন? লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রজনী হচ্ছে সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতারা ও রুহ (হযরত জিব্রাঈল আ.) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, শান্তিই শান্তি সেই রজনী, সুবহে সাদিক পর্যন্ত।' এ সুরাটির শানে নজুল বা অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হাদিস শরিফে রয়েছে, মহানবী (দ.) বনী ইসরাইলের চারজন নবীর উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা প্রত্যেকে ৮০ বছর করে ইবাদতে বিভোর ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত হননি। আর আল্লাহর কোনো আদেশের বিপরীতেও চলেননি। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হন। সেই মুহূর্তেই হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবীজির (দ.) কাছে উক্ত কদরের আয়াত শুনালেন, প্রিয় নবী (দ.) আরো বলেছেন– 'আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতদের ওপর লাইলাতুল কদর দান করেছেন। অন্য নবীদের ওপর এ বিরাট দান প্রদত্ত হয়নি।' প্রিয় নবীর (দ.) সুন্নাত অনুযায়ী মাহে রমজানের শেষ দশকে এর তালাশে ইবাদত করা উচিত। পবিত্র কুরআনে এ রাতকে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ উল্লেখ করা হয়েছে। লাইলাতুল কদর কোন রাত এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসুলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেছেন : তোমরা লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করো রমজানের শেষ দশকে বিজোড় রাত্রিতে (মিশকাত)। লাইলাতুল কদর প্রাপ্তির লক্ষ্যে রমজানের শেষ দশকের রাতসমূহে ইবাদতে মশগুল থাকা উত্তম। তবে সাতাশতম রাতের ব্যাপারে নির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় এবং এ মোতাবেক যুগে যুগে মুসলমানরা লাইলাতুল কদর পালন করে আসছে। লাইলাতুল কদরের ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (দ.) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সাওয়াব বা পুণ্যের আশায় রমজান মাসে রোজা রাখে তার পেছনের সব পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে ইবাদত করবে তার পেছনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (বুখারি শরিফ) তবে এ রাতে ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, গণক, অপরের নিন্দাকারী, হিংসুক, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ও মাতাপিতার অবাধ্য লোকদের দোয়া কবুল হবে না। খাঁটি নিয়তে অনুশোচনা ও তাওবা করলেই মুক্তির আশা করা যায়। অন্যের সম্পদ হকদারকে ফিরিয়ে না দিলে এ রাতেও মুক্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এ রাতে নফল নামাজ, দোয়া দরুদ, জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, মাতা-পিতা ও মুরুব্বিদের কবর জিয়ারত এবং মহান অলী বুজুর্গদের মাজার শরীফ জিয়ারত করা ও দান সাদকা করা অতীব উত্তম। এতে অধিক পুণ্য অর্জিত হয়। এ রাতে বেশি বেশি এ দোয়াটি পাঠ করা উত্তম। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়্যান তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি। 'হে আল্লাহ। আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা চাওয়া আপনি পছন্দ করেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' মহান স্রষ্টা আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে হেঁটে মানবজাতি আজ খোদায়ী আক্রোশে নিপতিত। বিপথগামী মানুষের সৃষ্ট দুর্যোগে দুনিয়াটাই আজ বাষ্পরুদ্ধ। যুদ্ধ-সংঘাত, হানাহানি আধিপত্য ও শোষণ-জুলুমে মানবজাতির স্বাধীন অস্তিত্ব ও মর্যাদা আজ হুমকির মুখে। দেশে দেশে চলছে আজ মুসলমানদের ওপর বৈরী শক্তির চরম জুলুম-নিপীড়ন। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মানুষও আজ নানাভাবে বিপদে, সংকটে, দুর্যোগে জর্জরিত।

বিশ্বজুড়ে মানবতার দুরাবস্থার এ দুঃসহ ক্রান্তিকালে হতভাগ্য জাতির সৌভাগ্য ও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করতে সবাইকে আল্লাহর দরবারে পুরোপুরি নিবেদিত ও সমর্পিত হতেই হবে। দেশ ও জাতির অগ্রগতি, মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি এবং নিপীড়িত মানবতার সত্যিকার মুক্তি যেন আজ লাইলাতুল কদরের পুণ্যস্পর্শে সবার করাতে জুটে আসুন সম্মিলিতভাবে এ মহিমান্বিত রজনীতে আল্লাহর দরবারে আকুল ফরিয়াদ ও আর্তি জানাই। আল্লাহ পাক সবাইকে লাইলাতুল কদর নসিব করুন। আমিন।

ঈদুল ফিতর : তৃণমূলের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মুখেও যেন থাকে ঈদের হাসি : রোজার শেষেই আসছে অনাবিল হাসি-আনন্দের ঈদ। শাওয়াল মাসের ঈদের চাঁদ উদিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকেন দেশের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা। ঈদের আনন্দে শামিল হতে রোজার মাসের শুরু থেকেই বিত্তবানরা নানা ধরনের কেনাকাটায় ব্যস্ত আছেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে রোজা ও ঈদ ত্যাগ ও আত্মসংযমের বার্তা নিয়ে এলেও ঘরে ঘরে ঈদের খুশি, রোজার ব্যতিক্রমী অনুভূতি সবাইকে স্পর্শ করে বলে মনে হয় না। মানুষে মানুষে মেলাতে, একে অপরের সাথে মানবিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার যে বার্তা ও আহ্বান নিয়ে রোজা এবং ঈদ আসে বছর ঘুরে, তা সবাই সমভাবে উপভোগ-উপলব্ধি করতে পারে জোর দিয়ে এই দাবি করা যায় না। বরং এই রোজা ও ঈদ গরিব, ভাগ্য বিড়ম্বিত, অভাবী মানুষের জন্য অনেক সময় বিষাদতুল্য ঠেকে এক শ্রেণীর বিত্তবানদের ভোগবাদী জীবনতৃষ্টির কারণেই। ঈদ মানে সর্বজনীন আনন্দোৎসব। ত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জীবনবোধে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রেরণার নামই রোজা। অথচ এই গরিব দেশে চারপাশে আমরা কী দেখছি? ত্যাগ ছেড়ে, আত্মশুদ্ধির পথ ছেড়ে বস্তুমোহে, বিলাসী জীবনে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মহোৎসব যেন চলে রোজা-ঈদ মৌসুমে। লোডশেডিং যন্ত্রণায় দেশের মানুষের আজ হাঁসফাঁস অবস্থা। সারাদিনে দেশের বহু জায়গায় ৩/৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। যে কারণেই হোক বিদ্যুৎ সংকটে শহর-গ্রামের নাগরিক জীবন আজ কাহিল। অথচ শহরগুলোতে মার্কেটে-মার্কেটে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা এতো বিধিনিষেধ সত্ত্বেও থামানো যায় নি। একটি গ্রামের ১০ হাজার মানুষের জন্য চাহিদার সমুদয় বিদ্যুৎ একটি মাত্র বহুতল মার্কেটের আলোকসজ্জা মেটাতে অবলীলায় হজম করে ফেলা হচ্ছে। মার্কেটগুলোর বিদ্যুৎ-জৌলুসের মাশুল গুনতে হচ্ছে হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহককে। অনেকেই রয়েছে গভীর অন্ধকারে, অপরদিকে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী বিদ্যুতের সীমাহীন অপচয়ে ভোগমত্ততায় দিন কাটাচ্ছে নিশ্চিন্তে। রোজা ও ঈদের আনন্দ মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান বিত্তবানরাই দু'হাতে লুফে নিচ্ছে। এ কেমন ত্যাগ, এটাই সংযম আমাদের? এতো গেল অপচয়-বিলাসিতার একটি মাত্র দিক। এভাবে হাজারো রকমের যন্ত্রণা নিষ্পেষণে-বৈষম্যে কোটি মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলার পথ আজ রুদ্ধ। শক্তিমান-বিত্তবানদের দাপটে-উপহাসে গরিব মানুষগুলোর চোখে-মুখে আজ হাসি নেই। এদের আনন্দ-খুশি কেড়ে নেয়া হচ্ছে। লাখ দেড় লাখ টাকা দামের হাজারো লেহেঙ্গা এই ঈদে ধনীরা প্রতিদিনই হজম করে নিচ্ছে, ঈদকে বিলাস জীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়ে বাহারি পণ্য ক্রয়ের উৎসবে ধনীরা মেতে আছে মাসজুড়ে। অথচ তাঁর আশপাশের শত শত গরিব অভাবী মানুষ নিজ স্ত্রীর জন্য এখনো শ'তিনেক টাকা দামের একটি শাড়ি, নিজের জন্য একটি সাধারণ লুঙ্গি, বাচ্চাদের জন্য কমদামের প্যান্ট-শার্ট কেনার সামর্থ্যও রাখে না। লাখ-দু'লাখ টাকার বাজেট নিয়ে কোমর বেঁধে নেমে ঈদের আনন্দের সবটুকুই ধনীরা লুফে নেয়। অন্যদিকে গরিব

মানুষেরা এই ঈদে জনপ্রতি একটি নিম্নমানের পোশাকও কিনতে পারে না। দারিদ্র্যের সীমাহীন কষাঘাতে ওরা জর্জরিত। ওরা বিপন্ন। ওরা অধিকার হারা। তবুও এই অভাবী দুস্থ মানুষের দিকে ধনীদের সহানুভূতির দৃষ্টি পড়ে না। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা, ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকার নামই কী রোজার সংযম, ঈদের চেতনা ও শিক্ষা? প্রিয়নবী (দ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজে পেট পুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাতর থাকে সে তো আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়'। এখানে প্রিয়নবী (দ) বলেছেন একজন সচ্ছল ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবেশী সে মুসলিম বা অন্য ধর্মাবলম্বী যেই হোক না কেন। বলা হয়েছে প্রতিবেশীর কথা। প্রতিবেশী সে যে ধর্মের, গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হোক তার দুর্দশায়- দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর কড়া নির্দেশনা স্বয়ং নবীজীর (দ)। তাহলে যে বিত্তবান মানুষগুলো লাখ টাকা দামের লেহেঙ্গা কিনে কৃত্রিমভাবে ঈদের আনন্দের ঘোলোকলা পূর্ণ করছে, তার পাশের দরিদ্র পরিবার অভাবে-কষ্টে ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারছে না- ওই পরিবারটির দিকে চোখ মেলে তাকানোর, সহানুভূতি-সহমর্মিতা দেখানো খুব জরুরি নয় কি? দেশ ও সমাজের সবাইকে হাসি-খুশিতে রাখাই তো বিত্তবান, সমাজপতি ও সরকারের নৈতিক-ধর্মীয় দায়িত্ব। খলিফাতুর রসুল ইসলামের সোনালি দিনের ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হযরত ওমর (রা) রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- 'শুধু কোনো মানুষ নয়, আমার শাসনের আওতাভুক্ত ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মরে তাহলে আমি ওমরকে আল্লাহর কাছে দায়িত্বে গাফলতির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এর জন্য আমি ওমরই দায়ী থাকবো'। এই হচ্ছে ইসলামের জীবন দর্শন। সাহাবায়ে কেরামের দায়িত্বনিষ্ঠা ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই একটি বাণী থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গের, নেতৃত্বের বহু কিছু শেখার আছে। একেই বলে প্রজাবাৎসল্য, মানবতাবোধ ও ইনসাফ। নিজে যথেচ্ছ খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্তে কাটানোর মোহ, খুব দামি পোশাকে ঈদ করার যে অভীপ্সা-আকাঙ্ক্ষা তা তখনই সার্থক ও পরিপূর্ণ হয় যখন চারপাশের মানুষেরাও একই মানের না হলেও কোনো রকম দিন চালানোর ভরসা পায়, ঈদ উদযাপনের আনন্দে শামিল হবার যদি সুযোগ পায়। অবর্ণনীয় কষ্টে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হওয়া আইলা-সিডর দুর্গত, নদীভাঙনে গৃহহারা, ছিন্নমূল পথ শিশুদের দিকে এই ঈদে একটু নজর দিন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করুন। সুখে-দুঃখে সমব্যথী হোন। এই মানবিক দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্র, বিদ্বান-বিত্তবান সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে। তৃণমূলের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের চোখে-মুখেও থাকে যেন ঈদের হাসি, আনন্দের ঝিলিক। এটাই সিয়াম ও ঈদের অন্তর্নিহিত দর্শন ও আহবান।

মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর বছর ঘুরে ফিরে এলো। মুসলিমরা এই ঈদে মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে। প্রাণে প্রাণে বইবে এদিনে খুশির জোয়ার। বছরের এই দিনটি কাটে খুবই উচ্ছ্বাসমুখরতায় ও জান্নাতি খুশির আমেজে-আবহে অগণিত মুসলিমকে ঘিরে। ঈর্ষা, দ্বেষ, অনৈক্য-দূরত্ব ও বিভাজনের যে প্রবণতা- এই দিনে তা থাকবে না। মানুষে মানুষে মিলনের মধ্য দিয়ে দূর হবে অমানবিকতা ও বিদ্বেষ-বিভেদের পাতানো যত নিষ্ঠুরতার খেলা। মানবতার কবি নজরুল তাই গেয়ে ওঠেন-'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ/ তুই আপনারে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ/ তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লাহ্/ দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ'-

মানবতার কবি নজরুলের দরদী কণ্ঠে ধ্বনিত ঈদুল ফিতরের মর্মভাষ্য। ঈদুল ফিতরের সারবত্তা ও ভেতরগত চেতনার কথা এই মহত্তম কবির চেয়ে বেশি করে কিছু বলার সাধ্য বোধ হয় আর কারো হয়নি অন্তত এই অর্ধশত বছরে। মানুষে মানুষে মেলাবার আহ্বান এবং ঘুমের ঘোরে অচেতন মুসলিম জাতির ঘুম ভাঙানোই যে ঈদুল ফিতরের ডাক- তাই নজরুল বলতে পেরেছেন তাঁর অসাধারণ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। দীর্ঘ এক মাস সংযম ও কঠোর সিয়াম সাধনার পর প্রতীক্ষিত ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে বারবার ফিরে আসে। সাম্য মৈত্রী মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পয়গাম নিয়ে আসে ঈদুল ফিতর।

বিগত দিনের পঙ্কিল জীবনচক্রে যে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব-দূরত্ব তৈরি হয় তা বেমালুম ভুলে গিয়ে সবাই আজ একই কাতারে শামিল। মুসলিম উম্মাহর অনাবিল আনন্দে মেতে উঠার দিন ঈদুল ফিতর প্রীতির এক পুণ্যময় বন্ধনে গ্রথিত করে সবাইকে। বিশ্ব মুসলিম সমাজের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় ঈদের আনন্দাবেগ। বর্ণ, গোত্র ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সকল মুসলিমই এ দিনটিতে উৎসবে শামিল হয়। তাই ঈদ মুসলিম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং ইসলামি কৃষ্টি-সংস্কৃতির শুদ্ধতম বহিঃপ্রকাশ। ঈদ শব্দের অর্থ ফিরে আসা, আনন্দ, খুশি, উৎসব প্রভৃতি। যে খুশির দিনটি মানুষের মাঝে বারবার ফিরে আসে তাই ঈদ। এবারের ঈদুল ফিতর দেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানবতার বিপর্যস্ত মুহূর্তে শান্তি ও কল্যাণের স্রোতে একাত্ম হবার আহ্বানে ফিরে এসেছে। ঈদুল ফিতর ডাক দেয় ঘুরে দাঁড়াবার, সত্য ও সুন্দরের পক্ষে গণজাগরণের বার্তা নিয়ে এসেছে ঈদুল ফিতর।

ঈদ উদযাপনের ইতিহাস নতুন নয়। যুগে যুগে প্রত্যেক জাতিই নির্ধারিত দিনে তাদের ঈদ উৎসব পালন করতো। পবিত্র কুরআনেও বিভিন্ন জাতির ঈদ উৎসবের বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই মিলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে আনন্দ উৎসব করতো। একবার তারা এতে ইব্রাহীম (আ.)কেও আহ্বান জানালো।- "অতঃপর তিনি তারকাজির প্রতি একবার তাকালেন এবং বললেন, আমি অসুস্থ। অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেলো।" (সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত-৮৮-৯০)। অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ও নির্ধারিত দিনে ঈদ উৎসব পালন করতো। মুসা (আ.) যখন তাঁর রিসালাতের দাওয়াত নিয়ে ফিরাউনের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন তখন "সে বললো, হে মুসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিতে? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপস্থিত করবো। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে এমন একটা স্থান ও সময় নির্ধারিত করো, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবো না তুমিও করবে না। মুসা (আ.) বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।" (সূরা ত্বোয়াহা-৫৭-৫৯)। হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় তাঁর সম্প্রদায়ের উৎসবের দিনেই আকাশ থেকে খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাজিল করা হয়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি মদিনাবাসীদেরকে দেখতে পান তারা 'নওরোজ' ও 'মিহিরজান' নামক দুটি উৎসব পালন করছে। এতে তারা নাচ গান, খেলাধুলা, কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠান পালন করছে। মহানবী (দ.) এ অনুষ্ঠান দুটির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় যে, তারা প্রাচীনকাল থেকেই এ দুটি উৎসব পালন করে আসছে। তখন নবী করিম (দ.) বললেন, আলাহ্‌তায়ালা তোমাদেরকে দুটি দিনের পরিবর্তে এর চেয়েও উত্তম দুটি দিন অর্থাৎ

ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা দান করেছেন।

হিজরতের অব্যবহতি পর হতেই ঈদুল ফিতর উৎসব পালন শুরু হয়। উল্লেখিত 'নওরোজ' ও 'মিহিরজান' উৎসব দুটির রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিপন্থী। শ্রেণী বৈষম্য, ধর্ম ও দরিদ্রের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য, ঐশ্বর্য অহমিকা ও অশালীনতার পূর্ণ প্রকাশে অযাচিতরূপে দীপ্ত ছিল এ দু'টি উৎসব। কিন্তু ঈদুল ফিতর ঘোষিত হবার পর আগের সমস্ত অরুচিকর আচার অনুষ্ঠান বদলে গিয়ে ঈদ যথার্থভাবে কাঙ্ক্ষিত নির্মল আনন্দে রূপ নেয়। এই মহান পুণ্য দিবসের উদ্‌যাপন শুরু হয় আজ থেকে ১৩৮৮ বছর পূর্বে। এটি অবশ্য সূর্য ভিত্তিক গ্রেগরিয়ান বা ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হিসাব। চন্দ্রভিত্তিক আরবি হিজরি বর্ষপঞ্জির হিসাব অনুযায়ী এটি হবে প্রায় ১৪৩২ বছর পূর্বে। মূলত মুসলমানগণ ঈদুল আজহার চেয়ে ঈদুল ফিতরেই বেশি আনন্দ উৎসব করে থাকে। এই দিনটি নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, আশরাফ-আতরাফ সকলেই এক অনাবিল আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। সকলেই এক মাঠে নামাজ পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবার দ্বার থাকে অবারিত। ধনীরা সাদকাতুল ফিতর এর মাধ্যমে নিঃস্ব ও বঞ্চিতকেও তাদের আনন্দের ধারায় শামিল করে নেয়। আমাদের দেশে এই দিনটিতে সকলেই সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন পোশাক ভূষিত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণীও এদিন থাকে আনন্দাপুত। তাদের পেট সেদিন অভুক্ত থাকে না, তাদের পকেটও থাকে না অর্থশূন্য। ইসলামের অর্থনৈতিক সাম্যের বিধান এ দিনই মূর্ত হয়ে ওঠে। সকলেই নতুন পোশাক পরিধান, একই মাঠে জমায়েত, একই ইমামের পিছনে তাকবির ধ্বনির সাথে নামাজ আদায়, বুকে বুক মিশিয়ে কোলাকুলি–এক নয়নাভিরাম স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। একই দৃশ্য সর্বত্র। দীর্ঘ রোজার পর ঈদুল ফিতর পরিশুদ্ধ আত্মাকে সিরাতুল মুস্তাকিমে অবিচল রাখতে প্রেরণা জোগায় এবং দীর্ঘ তাকওয়ার প্রশিক্ষণকে বাস্তব রূপ দিতে শুরু করে।

এক টুকরো চাঁদ একটি জাতির জীবনে কতোখানি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শাওয়ালের নতুন এক ফালি চাঁদ। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো ঈদের প্রকৃত চেতনা ও শিক্ষা থেকে আমরা যোজন যোজন দূরত্বে থেকে এর ফযিলত ও মাহাত্ম্য ভুলে গেছি। ঈদ যেন আজ কেবলই আচার-আনুষ্ঠানিকতা ও খেল তামাশায় রূপ নিয়েছে। ঈদের মূল শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ছেড়ে মুসলিম জাতি ক্রমশই ভোগবাদী অপসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ভোগ সর্বস্ব জীবনই বেছে নিচ্ছে আমাদের অনেকেই। অথচ নিঃস্ব অসহায়দের মুখে হাসি ফোটানোই ঈদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও শিক্ষা। আজ ঈদের মূল শিক্ষা আমাদের মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ব্যথিতের কষ্ট দূর করা ও তার ব্যথাই সমব্যথী হওয়াই ঈদের শিক্ষা। সেই ব্যথিত ব্যক্তি আমার প্রতিবেশী হোক, আত্মীয় হোক কিংবা তার অবস্থান হোক সহস্র যোজন দূরে। নবী করিম (দ.) বলেছেন-মুমিন সমগ্র একটি দেহের ন্যায়। তার কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ কষ্ট অনুভব করে। মুমিনদের আত্মাগুলোকে একটি সূত্রে গ্রন্থনই ঈদের মৌলিক আবেদন।

২০১০ সালে এবারের ঈদুল ফিতর একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে উপস্থিত। আজ আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গভীর সংকট ও হতাশার মধ্য দিয়ে দিন পার করছি। পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে প্রতিনিয়ত আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রমেই কমছে মানুষের দাম। শান্তি, স্বস্তি নেই কোথাও। সর্বত্র অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, জুলুম, নিপীড়নের ভেজর দিয়ে আমাদের নিত্য পথচলা। ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, লেবানন, চেচনিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মিরসহ সর্বত্র মুসলমানরা আজ করুণ অবস্থার শিকার। পরাশক্তির হিংস্র ছোবলে সমগ্র মুসলিম জনপদ আজ ক্ষতবিক্ষত ও দলিত। সেখানে তাদের জীবন ও সম্পদের কোনো নিরাপত্তা নেই। পরাশক্তির অস্ত্রের গোলায় ছিন্নভিন্ন হচ্ছে মুসলিম জনপদ। সুতরাং ঈদুল ফিতরের আনন্দের মুহূর্তে দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত মজলুম মানবতার কথাও আমাদের ভাবতে হবে। কিভাবে একটি সুখী সমৃদ্ধ মানবতাবাদী বিশ্ব গড়া যায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে জাতীয় ও বিশ্বনেতৃত্বকে। শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততা নয়, চারপাশে চোখ মেলে তাকাতে হবে আমাদের। অভাবী, দুঃখক্লিষ্ট নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই যে ঈদের আসল শিক্ষা তা আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। মেকি অশীল ভোগসর্বস্ব আনন্দ উৎসবে মত্ত না হয়ে নিপীড়িতদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ঈদ পালন করা প্রয়োজন। ঈদের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবনের মাধ্যমে ধনী-গরিব সবার মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হোক। বিভেদ বিদ্বেষ ভুলে গড়াগড়ি-কোলাকুলিতে কাটুক এইদিন।

একটি বিষয়ে সবাইকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। শহরাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ঈদে প্রিয়জনের সাথে মিলিত হতে নাড়ির টানে ছুটে যান গ্রামে গ্রামে। বাসাবাড়ি থেকে বেরিয়ে যেই গাড়ি তালাশ করবেন–তখনই মাথায় বাজ পড়ার দশা আপনার। পরিবহনের সংকট কিংবা পরিবহন- ত্রাসীদের সীমাহীন উত্ত্যক্তির মুখোমুখি হতেই হবে আপনাকে। ঈদ যেন এখানেই শেষ হয়ে যায় ঘরমুখো মানুষের। এক সাথে লাখো মানুষ নগরী ছাড়লে পরিবহনের সংকট হতেই পারে। ঝামেলা-বিড়ম্বনা শুধু পরিবহনের সংকটের জন্য হলে প্রবোধ পাওয়া যেত। না, তেমন তো নয়। শত শত গাড়ি। কিন্তু আপনার জন্য কোনো টিকিট নেই। চড়া দামেও টিকিট কিনবেন উপায় নেই। একশ্রেণীর পরিবহনত্রাসীর দাপটে-উৎপাতে বেশি দাম দিয়েও গন্তব্যে যাওয়ার ভরসা পান না দুরপাল্লার অসংখ্য যাত্রী। কেন এমন হবে? কিছু মানুষের লোভ ও নিষ্ঠুরতায় কেন ঈদের আনন্দ ফিকে হয়ে পড়বে– কেন চলবে পরিবহন সেক্টরে ভয়াবহ অরাজকতা? এটা মুসলমানদের থেকে আশা করা যায় না। অথচ পথচারী, গন্তব্যে যাতায়াত করা মানুষের স্বাভাবিক পথচলার সুযোগ সৃষ্টি করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা পেশ করেছেন আমাদের প্রিয়নবী (দ)। পথের বাধা-প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দিতে রাস্তায় চলাচলকারী অন্যদের প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ হবার আহবান জানিয়েছেন উম্মতের করুণাধারা নবীজী (দ)। 'ওয়াকাফ্হুল আজা আনিত তারিক'– 'তোমরা পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে নাও'– দ্ব্যর্থহীন দায়িত্বমুখী এই পথ নির্দেশনা স্বয়ং নবীজীর (দ)। এ নির্দেশনা এখানে কতোটা মানা হচ্ছে তাই ভাববার বিষয়। পথে পথে যানজট, গাড়ির বেপরোয়া চলাফেরা, টিকিট বাণিজ্যের খপ্পরে যাত্রীদের জিম্মিদশা, নিত্য দুর্ঘটনায় প্রাণনাশ, অধিক বোঝাইয়ের কারণে লঞ্চডুবিতে প্রাণহানি– এসব তো ঈদের দিনগুলোর স্বাভাবিক দৃশ্য। যারা এ ধরনের ফাঁদ পেতে ঈদের আনন্দকেই মাটি করে দিচ্ছে তাদের রাশ টেনে ধরার যেন কেউ নেই। বছর বছর ধরে চলছে ঈদ মৌসুমে যাত্রীদের ঘিরে শত অত্যাচার, জঘন্য জুলুম। এই ঈদে অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা ও বিবেকবর্জিত দুঃসহ কর্মকাণ্ড আর নয়। হয়রানি ও উত্ত্যক্ত পরিস্থিতি থেকে বেঁচে যেন সত্যি সত্যি সবার জীবনে হাসি-খুশির রেশ জারি থাকে এবারের ঈদে একজন নিষ্ঠাবান নবীর উম্মত হিসেবে আপনার কাছেই থাকলো এই প্রত্যাশা। আমার-আপনার লোভ ও নিষ্ঠুরতায় ঈদ যাতে দুঃখজনক স্মৃতি হয়ে না থাকে কারো জীবনে।

* আ ব ম খোরশিদ আলম খান: সাংবাদিক

আত্মশুদ্ধির সপ্ত পদ্ধতি

• শরীফ মোহাম্মদ আরীফ-উর-রহমান •

"শরীয়ত আমার রচনাবলী, তরীকত আমার জীবন নির্বাহের কর্মধারা, মারফত আমার নিগুঢ় তত্ত্ব, হাক্বীকত আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।" (আল-হাদীস)

এ চারটি বিষয়ে জ্ঞান চর্চা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। কারণ, এ চারটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা মানে পরিপূর্ণ ঈমানি জীবন ব্যবস্থা লাভ করা। উপরোক্ত বিষয়গুলো জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রিয়নবী (দ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,-"কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেওনি ইউহবিবকুমুল্লাহ ইয়াগফি রুলাকুম জুনুবাকুম ওয়া আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম।" (আল-কোরআন)। অনুবাদঃ- "ইয়া রাসুল (দ) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। আল্লাহ্ তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালা।" উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ এবং নবীর প্রতি ভালাবাসা তথা প্রেমের কথাই শিক্ষা দিলেন। ঐশী প্রেমের দীক্ষা নিয়ে প্রিয় নবীর ওয়ারেছ তথা নায়েব হিসেবে আউলিয়া কিরামগণ মহান ইসলামের দাওয়াত প্রচার করে আসছেন। যেমন : মাইজভাণ্ডারী মরমী গানে উল্লেখ আছে–

"আউলিয়া নায়েবে নবী জাহেরা মৌলবী নয়,
তরীকতের পন্থী যারা তাঁদের হাতে দীক্ষা লয়,
আউলিয়ার হাত খোদারী হাত কোরানেতে সুবর্ণনা,
প্রেমেরী সন্ধানে চল মন।"

এ আউলিয়া কেরামগণের ঐশী প্রেমের মত দর্শন বিভিন্ন নামে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন : সূফীবাদ/ আধ্যাত্মবাদ/ অতিন্দ্রীয়বাদ/ ও মরমীবাদ যাঁদের নিকট থেকে ঐ সূফীদর্শনের সূচনা তাঁরাই হল আসহাবু সুফ্ফা। মসজীদে নববীর সামনে আসহাবু সুফ্ফারা অবস্থান করতেন। উল্লেখ্য যে, যারা পশমের মোটা সুতার কাপড় পড়তেন তাঁদেরকে আসহাবু সুফ্ফা বলা হত। ৭০ থেকে ৪৫০জন আসহাবু সুফ্ফাদের সংখ্যা ছিল বলে সূফীতত্ত্বের ইতিহাসে জানা যায়। তাঁরা ছিলেন সংসার ত্যাগী। নির্বিলাস ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে বিশ্বাসী। তাঁরা নবী এবং আল্লাহ্ প্রেমিক। কথিত আছে যে, তাঁদের ক্ষুধা পেলে প্রিয় নবীজীর পবিত্র হুজরা শরীফের চৌকাঠে মাথা ঠেকাতেন এবং দয়াল নবী হুজরা শরীফ থেকে বের হলে হুজুরের নূরানী চেহারা মোবারক দেখে তাঁরা আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকরিয়া আদায় করতেন। তাই তারা ছিলেন ফানাফির রাসূল এবং ফানাফিল্লাহ। তাঁরা কঠিন রিয়াজত এর মাধ্যমে ষড়রিপু: লোভ, মোহ, কাম ক্রোধ, মাৎসর্য, মানব দেহ ও আত্মার পরম শত্রুকে জয় করে আল্লাহ্ ও রাসূলের বন্ধু হিসেবে সাব্যস্ত হন। অর্থাৎ অলী আল্লাহ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঐ সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবুযর গিফারীর (র) আত্মবিশ্বাস ছিল আগামীকালের জন্য খাদ্য জমা রাখা আল্লাহ্র উপর অবিশ্বাসের শামিল। কারণ আগামীকালের রিযিকের মালিক তো আল্লাহ্।

এখানে উল্লেখ্য, আগামীকালের জন্য খাদ্য জমা রাখা শরাবিরোধী নয়। আগামীকাল তো অবশ্যই আল্লাহ্ আছেন। তিনিতো রিযিকের জামীনদার। তাসাউফ এর ইতিহাসবেত্তাগণ মনে করেন, আসহাবু সুফ্ফা থেকে সূফীবাদের উৎপত্তি। সূফীতত্ত্ব বিশারদগণের বিশ্বাস, সূফীতত্ত্ব মানেই ঐশী প্রেম। আর এই ঐশী প্রেমের উৎপত্তি যবলে নূরে বা হেরা পর্বতের সেই নির্জন গুহায় যেখানে প্রিয় নবীজীর স্রষ্টা প্রেমের নির্জন সাধনার সৃষ্টি হয়। জ্ঞান ধর্মে বিশ্বাসীদের তিন স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন : ফতোয়ায় বিশ্বাসী যুক্তিবাদী আলেমগণ, তাকওয়ায় বিশ্বাস খোদাভীরু আবেদগণ, আর প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐশী প্রেমিক আরেফগণ। উদাহরণ স্বরূপ (ঈদ মানে খুশি) ঈদের দিন খুশি করা এটা হলো ফতোয়া, আবার ঈদের দিনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে হযরত আমীরুল মু'মেনীন ওমরের (র) রোনাজারী করা হল তাকওয়া, তারপর হলো হুব্বুন বা প্রেম। এটা হলো মক্কা বিজয়ের পর হুজুর পাক (সা) এর মোবারক কাঁধে উঠে হযরত আলী (র)-এর কাবা ঘরে শেষ মূর্তি ভাঙ্গা হলো প্রেম বা খোদায়ী রহস্য। কারণ, যুক্তি হলো গোলামের কাঁধের উপর মুনিব আরোহণ করা।

কিন্তু প্রেমের কাছে যুক্তি হার মানলো। হয়তো ইহা হযরত আলী (র)-এর মাধ্যমে বেলায়তের উদ্বোধন করার নিমিত্ত ঘটেছিল। কারণ, বেলায়ত মানেই প্রভু সন্তুষ্টির মাধ্যমে মহান আত্মার নৈকট্য অর্জন।

ধরা যাক, প্রেম হলো একটি সূক্ষ্ম গাড়ির মত। আর জ্ঞান হলো একজন দক্ষ ড্রাইভার বা চালকের মত। পথটি হলো তরিকা বা "সিরাতুল মুসতাক্বিম"। আর লক্ষ্য হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-ইশ্‌ক বা প্রেমে বিশ্বাসী কুতবিয়ত প্রাপ্তির জন্য তত্ত্ব জ্ঞান অপরিহার্য। যেমন : হযরত গাউসুল আজম দস্তগীর (ক) তাঁর কসিদা শরীফে উল্লেখ করেছেন, "দারাল্তল এল্‌মা হাত্তা সিরতুকুতুবান।" ইল্‌ম অর্জন (যা ইল্‌মে লদুন) করার ফলে আল্লাহ্ আমাকে কুতুবিয়ত দান করেছেন। উল্লেখ্য যে, এবাদত আর রিয়াযত দিয়ে অলি আল্লাহ্ হওয়া যায়। কিন্তু কুতবিয়ত পেতে হলে অবশ্যই ইল্‌মে লদুন বা তত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। কারণ, কুতুবিয়ত হলো অধ্যাত্ম প্রশাসন। আর প্রশাসন চালাতে হলে প্রশাসনিক জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এ জ্ঞান লাভ করতে হলে ফানাফিশ শায়খের মাধ্যমে সিনা হতে সিনায় লাভ করা সম্ভব। যথা খোদায়ী পথে তত্ত্ব জ্ঞান, যেমন-মাইজভাণ্ডারী মরমী গানে উল্লেখ আছে-

"চলরে মন ত্বরা যাই, বিলম্বের আর সময় নাই, গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী স্কুল খুইলাছে, সে স্কুলের এমনি ধারা বিচার নাইরে জোয়ান বুড়া, সিনায় সিনায় লেখা পড়া শিক্ষা দিতেছে। বেলায়তের অধিকারী অলি আল্লাহ্ বা সূফী সাধকগণের পরিচয় দিতে গিয়ে পবিত্র কোরানে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন-"বালা আন আসলামা ও ইয়াযহাহু লিল্লাহে ওয়াহুয়া মুহসিনুন ফালাহ ইনদা রাব্বিহী ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন।" অর্থাৎ-যে নিজেকে নিজের সর্বস্বত্ত্বাকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বা আল্লাহ্‌র নামে নিবেদন বা সমর্পণ করেছেন এবং সৎ কাজে নিয়োজিত আছেন তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরষ্কার (সুনিশ্চিত), তাঁর ভয় ও অশান্তির কোন কারণ নেই।" আর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন-"ওয়ালা তাহছাবান্নাল লাজিনা কুতিলু ফি ছাবিলিল্লাহে আমওয়াতা বাল আহইয়াউন।" অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করেন তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারণাও করোনা এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে জীবিত। তাঁদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক দেয়া হয়।" সে সূত্র ধরে আল্লাহ্‌র আউলিয়া কিরামগণ কঠোর সাধনা রিয়াযত, মুজাহেদা কিংবা আপন নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ বা সংগ্রামের মাধ্যমে মৃত্যুকে বার বার মৃত্যু ঘটানোর পর এক রহস্যময় জগতের সন্ধান লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত গাউসুল আজম দস্তগীর (ক) তাঁর কসিদা শরীফে উল্লেখ করেন, ওয়াত্‌লা আলি আলা ছিররিন কাদিমিন, ওয়াকাল্লাদানী ওয়াতা আনী ছোয়ালী।"

অর্থাৎ-

"চিরন্তনের রহস্য মোরে দেখালে করে উন্মোচন
পরাল গলায় জয়ের মালা পুরালো যত আকিঞ্চন"।

মৃত্যুকে জয় করে সাধক মৃত্যুহীন জীবন বা হায়াতে জাবেদানী বা অনন্ত জীবন লাভ করেন। সূফী দর্শন অনুযায়ী অহং বা আমিত্বের বিনাশ বা ষড়রিপুর ধ্বংস সাধনের নামই হলো মৃত্যু। এ উক্তির সমর্থনে প্রখ্যাত সাধক হযরত জোনাইদ বোগদাদী (রা) বলেন, সূফীতত্ত্ব হলো নিজের কাছে মরে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র কাছে বেঁচে উঠা। এই মৃত্যুহীন জীবন লাভকারী হযরত আউলিয়া কেরামের মধ্যেও দুই প্রকার চরিত্রের সূফীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ওয়াহাদাতুল ওয়াজুদ এবং ওয়াহাদাতুশ শাহুদ। ওয়াহাদাতুল ওয়াজুদে বিশ্বাসী সূফীগণের মতে সৃষ্টি বলতে কিছুই নেই। সব খোলসে বা অস্তিত্বে খোদাই বিরাজমান, তাঁদের মতে আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই নেই। তাঁরা পবিত্র কোরানের এই আয়াতগুলোতে প্রত্যেক সৃষ্টি স্রষ্টারই প্রকাশ হিসেবে বিশ্বাস করে। যেমন :

১. কুল্লু ইউমিন হুয়া ফিশান (নিত্য নব সাজ) সূরা আর রহমান (২৯)
২. আল্লাহু নুরুচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদে (আল্লাহ্‌ই আকাশ ও পৃথিবীর আলো) সূরা নুর (৩৫)
৩. "লিল্লাহি মা-ফিস ছামাওয়াতি ওয়াল আবদি" আকাশ ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই বাকারা (২৮৪)

এখন আসুক আল্লামা ইকবালের খুদী রহস্য। খুদী দুই প্রকারের হয়। যথাঃ খুদী ইয়াজদানী আর খুদী শয়তানী। অর্থাৎ যে কলব বা খুদী শয়তানী চরিত্রের হয় তা হল খুদী শয়তানী আর যে কল্‌ব বা খুদী খোদার চরিত্রে চরিত্রবান হয় তাহাই খুদী ই ইয়াজদানী। এ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে (খোদায়ী চরিত্রবান হয়ে) প্রখ্যাত সূফী সাধক হযত মনছুর হাল্লাজ (র) আনাল হক বলেছেন ও প্রখ্যাত আরেফ হযরত বায়েজীদ (র) (তাইফুর) বোস্তামী বলেছেন, "মা আজামু শানি" অর্থাৎ "আমি বড়, আমার মহিমা কত বড়?"

আল্লামা রুমী (র) বলেছেন–"হামা উস্ত" অর্থাৎ "আনাল হক" গুপ্ত রহস্যেরই উদ্‌ঘাটন "আনাল হক, আল্লাহ্ ছাড়া আর কে বলতে পারে? পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে "তাখলাকু বে আখলাকিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে নিজেকে ভূষিত কর। হযরত আরফে রুমি মসনবীতে বলেন–

"আশেকারা মিল্লাতে মজহাব জুদা আস্ত
দিনে ইশ্‌ক আজহামা দিনে জুদাস্ত।"

অর্থাৎ "প্রেমিকের ধর্মই হল আল্লাহ্‌র ধর্ম। সে ধর্ম অন্য সকল ধর্ম হতে পৃথক।" দেওয়ানে হাফীজে আল্লামা হাফীজ বলেন, "হে যুবক সাধনা করে যাও? সত্যের বিদ্যায়তনে ও প্রেমের শিক্ষকের কাছে।" উল্লেখ্য যে, এই প্রকারের সূফী সাধক বা অলী আল্লাহ্‌গণ ফানা বা নির্বানের মাধ্যমে জলওয়ায়ে রহমানী বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিলীন হওয়ার জাহেরী (শরীয়েত ধর্ম) এবাদত সম্ভব হয় না বিধায় তারা বিভোর চিত্তের কারণে বিধান ধর্মের আওতায় পড়েন না । এর সমর্থনে মাওলানা রুমি মসনবীতে বলেন,

"দলখতব ছেকারে আয়েদ তসবিহ ওয়া খিরকী
খোদরা জে আমল হায়েনে কোহিদা বরিদার।"

অর্থাৎ "ছিন্নবস্ত্র তাসবীহ ও আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? নিজেকে সৎকর্ম দ্বারা উন্নত করা"। আল্লামা রুমি আরও বলেন,

"মিল্লতে এস্ক আজহোমা মিল্লাতহা জুদাস্ত
আঁশেকারা মিল্লত ও মজহাব খোদাস্ত।"

অর্থাৎ "প্রেমের সম্প্রদায় অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায় হতে ভিন্ন, যাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেমিক তাঁদের মজহাব ও সম্প্রদায় একমাত্র আল্লাহ্" তাঁর মসনবীতে তিনি আরও বলেন–

"গরতু ছঙ্গে খারাও মরমর শেবী
গর বছাহেব দিল রছি গাওহর শাবী।"

অর্থাৎ "তুমি যদি শক্ত মর্মর পাথরও হও কামিল পীরের সান্নিধ্যে গেলে গহর নামক মহা রত্নে পরিণত হইবে।" আমরা ধর্ম পালন করি, ওই ধর্মের অর্থই হলো ধারণা করা। যেমন : একজন গাড়ী চালক তার গাড়িটি চালু করে দিয়ে চালনার ধারণ না থাকলে গাড়ির যেমন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তেমনি মানুষও যদি তার আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ধর্মকে না বুঝে তার জীবনই চালকবিহীন গাড়ির মত বিপদজনক হয়। তাই ধর্মের সাথে যদি মর্মের যোগ না হয় সে ধর্মই অসাড় বা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, ধর্ম মানেই ধরের মর্ম বা দেহতত্ত্ব। নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করেছে যে নৈতিক চরিত্র ও আত্মশুদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। (আল কোরআন, সূরা শামস, ৯/১০ আয়াত)।

একজন মানুষেরকে তার জীবনের মূল্যায়নের জন্য যে কয়েকটি বৈশিষ্টপূর্ণ দিক থাকা প্রয়োজন, তা হলো নৈতিক চরিত্র, আত্মশুদ্ধি। মানবিক মূল্যবোধ ও মুক্তবুদ্ধি (বা তত্ত্ব জ্ঞান), চিত্ত চেতনা বা আত্ম চেতনার মাধ্যমে সাধকের বা প্রেমিকের আল্লাহ্ মিলনের দ্বার উন্মোক্ত হয়। মানুষ তার মানবীয় মূল্যবোধ বা মৌলিক সত্ত্বার পরিচয় পায়। আর চিন্তার চেতন (ইন্দ্রিয়জাত বা মস্তিষ্ক ভিত্তিক যাহা মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়) ধর্মের বা কোরানের বাহ্যিক বা ভাষাগত রূপক ও শাব্দিক অর্থের উপর প্রভাব থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কোন ফলের সৌন্দর্যও বাহ্যিক রূপের উপরই। ফলের রসের বা স্বাদের ও প্রাণ শক্তির খবর চিন্তা-চেতনার বাইরে চিত্ত চেতনা বা আত্ম-চেতনা সম্পন্ন সাধকগণ(ফলের) বাহ্যিক রূপকের ধার ধারে না বরং তারা রসের স্বাদ ও প্রাণ শক্তিই লাভ করে এবং এ মৌলিক সত্ত্বায় বিশ্বাসী ও চিত্তচেতনায় সাধক তার পরমাত্মার মিলন অভিসারে যখন নিজ সত্ত্বার বা আমিত্বকে বিলীন বা নির্বাণ করে তখন তার চিন্তার অবচেতন সৃষ্টি হয়। বিভোর চিত্তে বা ভবঘুরে পাগল বেশে দেখা গেলেও চিত্তে তার চেতন থাকে।

কবি নজরুলের ভাষায় :
"আমি অচেতন আমার চিত্তে চেতনা।"
অথবা,
"আমি উম্মাদ, উম্মাদ আমি চিনেছি আমারে
আজিকে আমার খুলিয়া গিয়েছে সকল বাঁধ।"

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বসূফী দর্শনে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রবর্ত্তক মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের অধ্যাত্ম শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ এবং বেলায়তে খিজরী তথা মুক্ত বেলায়তের রূপকার হযরত গাউসুল আজম শাহ্‌সূফী সৈয়দ মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক)। এ মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার অনুসরণ, এ ত্বরীকার দীক্ষা গ্রহণ ও উসূলে সাবআ সপ্ত পদ্ধতিকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত সূফীতত্ত্বের অনুকরণ এবং ঐশী প্রেম অন্তরে লালন করা একটি সহজতর ব্যাপার। কেননা, মাইজভাণ্ডারীর ত্বরীকা দূর

দৃষ্টিসম্পন্নতায় সুদূর প্রসারী চিন্তা চেতনার বিকাশে শরীয়ত, ত্বরীকত, মারিফত ও হাক্বীকত প্রভাবে কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস সমন্বয়ে সম্পূর্ণ যুগোপযোগী সর্বজনকল্যাণময় ত্বরীকা। এ মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকা বাংলার জমীনে প্রতিষ্ঠা করে এতদঞ্চলে তাঁর করুণাধারা প্রবহমান করে সৃষ্টি তথা মানবতার মহা কল্যাণ সাধন করেন। ইহা আমাদের জন্য এক নিয়ামতে উজমা স্বরূপ।

উসূলে সাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি

(১) "ফানায়ে সালাসা"– "ফানা আনিল খাল্ক" অর্থাৎ কারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা ও কামনা না থাকা। যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি যথাযথ আস্থা জন্মে। ফলে "জলুমান" বা জুলুমকারী সাব্যস্ত হয় না।

(২) "ফানা আনিল হাওয়া"– অর্থাৎ যা না হলেও চলে সেই রূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। যার ফলে জীবন যাত্রার পথ সহজ ও ঝামেলা মুক্ত হয়। ফলে খোদাতায়ালার পক্ষে বেহেস্তের ওয়াদা বিদ্যমান আছে দেখা যায়।

(৩) "ফানা আনিল এরাদা"– অর্থাৎ খোদায়ী ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া। নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদাতায়ালার ইচ্ছার নিকট বিলিন মনে করা। সূফী পরিভাষায় যাকে "তসলীম" ও "রজা" বলে। কাজেই সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে "জহুলান" বা মূর্খতা থাকেনা, যা কোরআনেরই পরিভাষা।

মওতে আরবায়া বা রিপুর চারি প্রকার মৃত্যু :

(৪) "মওতে আবইয়াজ বা সাদা মৃত্যু"– ইহা উপবাস ও সংযমে হাসিল হয়। যার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়।

(৫) "মউতে আহওয়াদ বা কালো মৃত্যু"– ইহা শত্রুর শত্রুতা বা নিন্দায় হাসিল হয়। যাহার কারণ, অপরের সমালোচনা বা নিন্দার পর সালেক বা এই আত্মশুদ্ধির পথের যাত্রী নিজ দোষ ত্রুটি বুঝতে সুযোগ পায় এবং পরিত্যাগপূর্বক খোদার দিকে আগাতে সক্ষম হয়। দোষ খুঁজে না পেলে খোদার শোকর গোজারী আদায় করার ফলে নিজের মনে বিরাট শক্তি সমাবেশ দেখতে পায়। তখন সমালোচনাকারীকে বন্ধুরূপে দেখে এবং নিজে বিশ্ব বন্ধুর পর্যায়ে উন্নীত হন।

(৬) "মউতে আহমর বা লাল মৃত্যু"– ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাসিল হয় এবং বেলায়তপ্রাপ্ত হয়।

(৭) "মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যু"– ইহা নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে হাসিল হয়। যার ফলে মানব অন্তঃকরণে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনা থাকে না। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত। এ ব্যক্তি ছাহেবে তাছাররোফও হয়ে যায়। হযরত আকদাছের এই সার্বজনীন শুদ্ধি প্রণালীর প্রতি নজর দিলে বুঝা যায়, তিনি বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউসুল আজম নিছবতাইনে আ'দমীর বা আগত বিগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী। যেহেতু এই মুক্তি পদ্ধতি নেহায়ত ঝামেলামুক্ত, উৎসাহমূলক, আনন্দদায়ক, হিংসাবিহীন এবং উভয় জগতের উন্নয়নমূলক নীতি, দেশ, জাতি, সাদা, কালো, সংসারী ও অসংসারী সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য ও সহজসাধ্য বিধি ব্যবস্থা। এ পথচারী সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল বুঝতে ও উপভোগ করতে সমর্থ। যাহা "মশীয়তে ইয়াজদানীর" বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সার্বজনীন যুগোপযোগী ব্যবস্থা ও রীতিনীতি।

পরিশেষে মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার তরীকতপন্থী করে আল্লাহ্ আমাদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মুক্তি সাধনের তৌফিক দান করুন। আমিন। বেহুরমতে সৈয়্যদুল মোরসালিন ও গাউচুচ্ছাকালাইন এয়া গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী (ক) শাইয়ান লিল্লাহ।

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে জান তিন ভাবে
বাক বিতন্ডা পরিহারে জানার আগ্রহে।
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে,
সুধাইনু সুধীজনে সুধীর ভাষণে।
না দেখাইবে পীর যাকে এই তিন ধারা
আসিবেনা সোজা পথে সে পথহারা।"

এই মাইজভাণ্ডারী ত্বরীকার স্বরূপ উন্মোচক বিশিষ্ট সংস্কারক অছিয়ে গাউসুল আজম শাহ্সূফী সৈয়দ মাওলানা দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক)।

অনিবার্য কারণে অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ খান সিরাজীর 'আধ্যাত্মিক পথ ও পাথেয়' শীর্ষক নিবন্ধের বর্তমান কিস্তি প্রকাশিত হলো না। আগামী মাস থেকে আবার যথারীতি ইন্শআল্লাহ্ যথারীতি প্রকাশিত হবে।

"কিতাব-উল-লোমা" (আলোকিত গ্রন্থ)

মূল–শাইখ আবু নছর সিরাজ আত-তুসী (রহ)

ইন্তিকাল-৩৭৮ হিজরী

॥ আবুল ফজল মোহাম্মদ ছাইফুল্লাহ সুলতানপুরী ॥

মুসান্নেফ-এর পুরো নাম আবু নছর আবদুল্লাহ বিন আলী আস সিরাজ আত্ তুসী। তার উপাধি হল "তাউছ আল ফুকরা"। তিনি তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইল্‌ম, ফজিলত, সাধনা, খোদাভীরুতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি উচ্চ বংশীয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি তাঁর যুগের প্রসিদ্ধ আলেমগণের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তার শাইখু-ত-তারীকত ছিলেন আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আল মুরতায়াশ (রহ) [ইন্তেকাল ৩২৮ হিজরী] শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মুরতায়াশ এর পীরি সিলসিলা হযরত সৈয়দুত তায়েফাহ জুনাইদ বাগদাদী (রহ) এর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি ৩৭৮ হিজরী সনে তুসে ইন্তিকাল করেন।

কিতাবুল লোমা তিনি কোন বছর রচনা করেছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে চারশ হিজরীতে তা তিনি রচনা করেছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ কিতাবকে তাসাউফ এর সর্বপ্রাচীন কিতাব সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে জ্ঞানীগুণীগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

কিতাবুল লোমার বৈশিষ্ট বর্ণনায় তাওরারিখ-ই তাসাউফ গ্রন্থকার বলেন–এ গ্রন্থের সবচেয়ে চমৎকার বৈশিষ্ট হল শাইখ সিরাজ (র) কোরআন হাদিসের আলোকে সূফীদের তরীকার বৈশিষ্ট সমূহ অধ্যায় অধ্যায় ভাগ করে তার বিশদ বর্ণনায় তা উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আবু সাঈদ ইবনুল আরবী (র) সেমা ও ওজদ এর উপর যে কিতাব রচনা করেছেন কিতাবুল লোমাতে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ এ গ্রন্থে তাসাউফের পরিভাষাসমূহ তিনি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন।

চতুর্থতঃ সূফীদের দুর্বোধ্য বিষয়াবলী তিনি এখানে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দাড় করিয়েছেন, যা সূফী সমাজে সমাদ্রিত।

পঞ্চমতঃ সূফীদের নিয়ে সমাদৃত মোল্লা সমাজে যে ধারণা প্রচলিত, তিনি তা এ গ্রন্থে খণ্ডনপূর্বক উত্তর প্রদান করেছেন এবং চারশত হিজরী সনের মধ্যে ইসমাঈলা, কারামতিয়া, বাতেনিয়া, শিয়া সম্প্রদায়ের প্রচলিত কিছু বদ আকীদা তাসাউফের মধ্যে সুকৌশলে অনুপ্রবেশের যে নীল নক্শা এঁটেছিল, হযরত শাইখ (র) তার এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাসাউফকে মুক্ত করে সঠিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন। কিতাবুল লোমা বস্তুত কোরআন এবং হাদিসের সারাংশ। তাই এ গ্রন্থকে একটি সংক্ষিপ্ত সূফীয়ানা তাফসীর বলা হয়ে থাকে। তাই সূফীগণের মতামত হল

كتاب اللمعة هو الكتاب الاعرف تاريخ التصوف الاسلامى

কিতাবুল লোমা ইসলামী সূফী ও তাসাউফ ইতিহাসে মাতার জননীতুল্য।

এ গ্রন্থের লেখক শাইখ আবু নসর সিরাজ আত তুসী (র) তুসনগরে ৩৭৮ হিজরী ইন্তিকাল করেন এবং তুস নগরীতে তার মাজার শরীফ অবস্থিত।

তাসাউফ এর সংজ্ঞা, সূফীদের মাজহাব জ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের অবস্থান :

"ইল্‌মে তাসাউফ" ও মাজহাব-এ সূফীয়াহ" এর প্রসঙ্গে কোন ব্যক্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চায় যে, উপরোক্ত বিষয়াবলীতে মানুষের মধ্যে মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। কেউ কেউ ঐ সকল বিষয়ের বৈশিষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের সীমা লংঘন গোচরীভূত হয়। আবার কেউ তাকে বোধ শক্তির বাইরে নিয়ে যায়। আবার কেউ উহাকে খেল তামাশা ও অজ্ঞতাকে চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়া বলে মনে করেন। আবার কেউ খোদাভীতি, দারিদ্র্য, মোটা কাপড় পরিধান করা, পরিচ্ছন্ন আলাপচারিতা এবং পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করা ইত্যাদিকে বুঝায়। আবার কেউ তাদের ধর্মচ্যুত ও পথভ্রষ্ট বলে গাল মন্দ করে। মোট কথায় আমি সূফীয়ানে কেরামদের চলন রীতিকে কিতাবুল্লাহ এর অনুসরণ, রসূল (দ)-এর অনুকরণ, সাহাবা তাবেয়ীন রিদুয়ানুল্লা আনহুম এর চরিত্র এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহদের চলন পদ্ধতি অনুসারে কুরান সুন্নাহর আলোকে প্রমাণসহ উপস্থাপন করবো যাতে "হক্ব" বাতিল দিবালোকের ন্যায় আলাদা আলাদা দৃষ্টিভূত হয়। তাসাউফের সকল বিষয়াবলী স্বীয় স্থানে স্পষ্ট হয় এবং যাতে এ কথাই প্রমাণ হয়ে যায় যে "ইল্‌মে তাসাউফ" দ্বীনের জ্ঞান সমূহের অন্তর্ভুক্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি বলার প্রয়াস পাই।

উল্লিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তরে বলি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মুমীনদেরকে তাঁর কিতাবকে মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের হৃদয় থেকে সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় দূরীকরণ পূর্বক তিনি ইরশাদ করেন, সে–

اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا

তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ় ভাবে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা।" তিনি আরো ইরশাদ করেন যে, –

وتعاونوا على البر والتقوى

"সৎ কর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা

করবে। অতপর অপর একটি স্থানে আল্লাহ্তায়ালা ফিরিশতাদের পর স্বীয় বান্দাহদের থেকে এবং দ্বীনি মর্যাদায়ও তাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। তার স্বীয় একত্ববাদের উপর ফিরিশতাদের পর তার বিশেষ সাক্ষী প্রতিষ্ঠা করেন, যেমন আল্লাহ্পাক বলেন–

شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة واولوا العلم قائما بالقسط

আল্লাহ্ সাক্ষী দেন যে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, ফিরিস্তাগণ এবং জ্ঞানীগণও আল্লাহ্র ন্যায় নীতিতে প্রতিষ্ঠিত–

রসূল মাকবুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে– العلماء ورثة الانبياء

"আলেমগণ নবীগণের উত্তরসূরী।"

শাইখ আবু নছর সিরাজ বলেন, "আমার মতে

اولى العلم القائمين بالقسط

এর উদ্দেশ্য হল নবীগণের উত্তরসূরীগণ। কেননা কিতাবুল্লাহকে দৃঢ়ভাবে যারা আঁকড়িয়ে ধরবেন এবং রসূল (দ) এর আদর্শ অনুশীলনকারীরা, সাহাবা তাবেয়ীনদের অনুসারীরা এবং তার প্রিয় মুত্তাকী বান্দাহদের চলনরীতি অনুসরণকারী হল এ শ্রেণীর লোকগণ।"

এ জাতীয় বান্দাহ্গণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত -মুহাদ্দেসীন বা হাদিস বেত্তাগণ, ফোকাহায়ে কেরাম ও সূফীয়ানে কেরাম, আর বর্ণিত এরাই হলেন اولى العلم قائمين بالقسط

এর প্রতিষ্ঠিত ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া বা নবীর উত্তরসূরী।

অনুরূপ ইল্মেরও অনেক প্রকার রয়েছে। যার মধ্যে একটি হল 'ইল্মে দ্বীন'। যা আবার তিন প্রকার তা হল ইল্মে কুরান, ইল্মে সুন্নাহ্ ওয়া বয়ান এবং ইল্মে হকায়েকে ঈমান।

কোরআন ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান, হাদিস বা সুন্নাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান এবং ঈমানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আর ঐ ইল্ম সমূহ মুহাদ্দিসিন, ফকীহ ও সূফীয়ানে কেরামদের মধ্যে প্রবর্তিত।

বস্তুত সকল উলুমে দ্বীন বক্ষমান তিন আয়াত শরীফ ও হাদিসে রসূল (দ) অলী আল্লাহ্দের কলব থেকে প্রবাহিত হিকমত থেকে খালি হয় না। তার মূল হল "হাদিসুল ঈমান" নামে হাদিসটি। যখন হযরত জিব্রাইল (আ) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে আরজ করলেন যে, দ্বীনের 'তিন উছুল' তথা ইসলাম ঈমান ও ইহসানে জাহেরী ও বাতেনী সম্পর্কে।

মূলতঃ ইসলাম হল প্রকাশ্য (স্বীকৃতি দেয়া) একটি বিষয় এবং ঈমান হল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (স্বীকৃতির) বিষয়। কিন্তু ইহছান হল প্রকৃত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মূল সৌন্দয্যের বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে নবী রউফুর রহিম (দ) ইরশাদ করেন–

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

ইহসান হল তুমি এভাবেই আল্লাহ্র বন্দেগানী কর যেন মনে করবে তুমি তাকে দেখছ। যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে মনে রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।" হযরত জিব্রাইল ইহা শ্রবণপূর্বক সত্যায়িত করলেন। "ইল্ম" আমলের সাথে একিভূত, আর আমলের সম্পর্ক ইসলামের সাথে। আর ইসলাম হল বান্দাহ তার ইল্ম ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর মুমীনগণ উল্লিখিত তিন শ্রেণী (মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সূফী) ইল্ম ও আমল এর মাধ্যমে একে অপর থেকে ভিন্ন ও ভিন্ন উদ্দেশ্য ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন মহান আল্লাহ্পাক সুবহানাহুতায়ালা তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক বর্ণনা করেন যে– والذين اوتوا العلم درجات

আর যাদেরকে ইল্ম দেয়া হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।"

তিনি আরো ইরশাদ করেন–

ولكل درجات مما عملوا

আর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কর্মানুযায়ী মর্যাদা–তিনি অপর স্থানে ইরশাদ করেছেন–

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

অবলোকন কর, কিভাবে আমিত্বকে অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–সকল মানব সন্তান চিরুনির দাতের ন্যায় সমান, তবেই ইল্ম ও খোদাভীতি ভিত্তিতে একে অপরের উপর মর্যাদা লাভ করেন। যদি কারো নিকট উছুলে দ্বীন বা ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলী, তার আনুসাঙ্গিক বিষয়, দ্বীনের দাবীসমূহ, তত্ত্বসমূহ ও বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি বিষয়সমূহে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয় তাদের উচিত যেন তারা মুহাদ্দিসিনে কেরাম, ফোকাহায়ে কেরাম ও সূফীয়ানে কেরামের নিকট গমণ করেন। উল্লেখিত তিন শ্রেণীর অধিকারীগণ ইল্ম বা জ্ঞান, আমল, হাক্বিকত বা মৌলিক বিষয়াদী সম্পর্কিত বিশেষ হাল বা বিশেষ অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত এবং তারা, ইল্ম, আমল, মকাম, কালাম ফাহাম, ফরাছত ও বয়ান (জ্ঞান, কর্ম, অবস্থান, তথ্যবহুল আলোচনা, বুদ্ধি, বিচ ক্ষণতা ও বর্ণনা) ইত্যাদি তাদের মতই আয়ত্ব করেন। আর যিনি তা ধ্বংস করেছেন তিনি অন্ধকারে রয়েছেন।

তাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যিনি সকল বিষয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। আর যিনি যে অবস্থানে উন্নীত হয়েছেন তা কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়েছেন।

আল্লাহ্ চাহে তো আমি সাধ্যানুযায়ী এ সকল প্রত্যেক প্রকারের উপর আলোচনার প্রয়াস রাখি, তারা কে কিভাবে ইল্ম ও আমলের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অপরাপর কি পার্থক্য ও তাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাবান কে। (চলবে)

ধারাবাহিক

'ইযাহুদ দালালাত ফি সেমা'ইল আলাত'

হযরত আল্লামা শেখ ইমাম আব্দুল গনী নাবলুসী (ক)

অনুবাদ : মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ শায়েস্তা খান / সৈয়দ আরিফ মঈনুদ্দিন

বিখ্যাত হানাফী ফকিহ হযরত আবদুল গনি নাবলুসী এক বিদগ্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৬৪১ ঈসায়ী সনে জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত ইসমাইল আব্দুল গণি ছিলেন হানাফী ফকিহ, কাজী এবং আরবী সাহিত্যের পণ্ডিত। শৈশবকাল থেকেই হযরত আব্দুল গনি নাবলুসী অত্যন্ত পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে ইসলামী জ্ঞানের চর্চা করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে তাঁর বয়স কুড়ি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শিক্ষকতা এবং ফতওয়া প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ এবং সালিহিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনারত অবস্থায় তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আশেপাশের শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল গনি নাবলুসী ১৭৩১ ঈসায়ী সনে নব্বই বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইসলামী জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি বিভাগে তাঁর রচনাসমূহ আজ পর্যন্ত গবেষণার অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য উপাদান হিসাবে বিরাজ করছে। তাঁর পরবর্তীকালের ইসলামী মণীষীগণের লেখনীতে হযরত আবদুল গনি নাবলুসীকে অনন্য সাধারণ জ্ঞানী এবং ওলী আল্লাহ্ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য হানাফী ফিক্‌হের কিতাব রাদ্দুল মুহতার (হাশিয়া ইবনে আবেদিন নামে সমধিক পরিচিত) এর প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবেদিন (ইন্তিকাল ১৮৩৬ ঈসায়ী) সমসাময়িক যে কোন ফকিহ্ এর চাইতে অধিক সম্মানের সাথে বিপুলভাবে হযরত আবদুল গনি নাবলুসীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শায়খুল আযহার ফকিহ ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল তাহতাবী হানাফী তাঁর হাশিয়া মারাকিল ফালাহতে হযরত আবদুল গনি নাবলুসীকে "আল আরিফ বিল্লাহ্ সাইয়েদী আবদুল গনি" সম্বোধন করেছেন।

মাইজভাণ্ডারী তরিকায় অনুসৃত বাদ্যযন্ত্রসহকারে শর্তসাপেক্ষে যে সেমার অনুমোদন রয়েছে তাকে শরিয়ত বহির্ভূত উল্লেখ করে কোন কোন সাময়িকীতে যে ফিতনার জন্ম দেওয়া হয়েছে তার নিরসনকল্পে এই বিখ্যাত হানাফী ফকিহ এর একটি প্রসিদ্ধ রচনা আমরা পাঠক সমীপে পেশ করছি। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক পরিহার করার সবিনয় অনুরোধ করছি।

অথচ নামমাত্র হাল আমলের এ সমস্ত ফকীহর চিন্তার সম্পূর্ণ অবস্থান ঐ কথার বিপরীতে। তারা আল্লাহর সৃষ্টি মানবজাতির কাছ থেকে শরীয়তের অনেক বিধিনিষেধ এই মর্মে গোপন করে যে–তাদের ধারণা আসলেই এসব গোপনীয়, আর সেই সূক্ষতর বিষয়ে তারা কিনা অবগত রয়েছে তাদের বিদ্যাশক্তির গভীরতা আর জটিলতর গবেষণার দ্বারা, আর এই সূক্ষ জ্ঞান নাকি সাধারণ মানুষের বুঝে আসবে না, এবং এ লক্ষ্যেই তারা আল্লাহর কিছু হুকুম আহকাম গোপন করে। এ তো নির্বিঘ্নে সাধারণ মানুষের প্রতি কুপ্রবৃত্তি ও বিদ্বেষ, এককথায় মন্দ ধারণা। বস্তুত কি– তা ঐ ফকীহদেরই অসম্পূর্ণতা। বান্দাদের তা কেনইবা বুঝে আসবে না– আল্লাহ পাক সুবহানুওয়াতা'লা তাদের স্বার্থেই যে এসব বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। অক্ষম ব্যক্তির উপর কোন কিছু তিনি চাপিয়ে দেন না। আপামর হোক বা বিশেষজ্ঞ হোক প্রত্যেকের উপরই আল্লাহপাক সুবহানুওয়াতা'লা শরীয়তের দায় অর্পণ করেছেন- তা বাস্তবায়নে নিশ্চয় তারা সক্ষম বলে–চাই তা ফরজ হোক বা নফল হোক।

ওদের অনেককে আমি আমার উপর এ আপত্তি আনতে শুনেছি যে– এলম আমল এতেকাদ সম্পর্কীয় যাবতীয় হুকুম আহকাম যা স্রষ্টা আরোপ করেছেন, তা কিনা আমি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করে দেই। তারা অপছন্দ করে সারগর্ভ যেসব দ্বীন ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য নবীজীর উম্মতদের উদ্দেশ্যে আমি বলি। এবং সবার উদ্দেশ্যেই যে বিশেষ ও আ'ম মজলিশের উপযোজন করি– এতে অর্পিত হুকুম আহকাম প্রসঙ্গে নানা উদাহরণের অবতাড়না করি– তা-ও তারা অস্বীকার করে। এ অস্বীকৃতির সমর্থনে নবী করিম (দঃ) এর হাদীস শরীফও তারা তুলে ধরেছে– "মানুষকে সম্বোধন কর তাদের বিবেক মতে।" এ হাদীসের বিশুদ্ধতা

মেনে নিলেও ওদের কথাগুলো ঠিকই রয়ে যাচ্ছে নবীজীর চলন প্রচলনের পরিপন্থী। নবী করিম (দঃ) তো মানুষকে তাবৎ যা সম্বোধন করেছেন- এমন কিছু কথা মানুষের বোধগম্য হয়েছে, আবার কারো কারো হয়ত অনেক কিছু বুঝে আসেনি- যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মে'রাজুননবী- যে কথা একটু আগেও বলেছি। আরেকটি লক্ষ্যনীয় দিক এ যে- আমাদের ধর্ম ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত পুরোটাই বিবেকের ভিত্তিতে নেবার উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের অস্থিতিশীল বিবেকবুদ্ধির ও ক্রমপরিবর্তনশীল যুক্তির মাপকাঠিতে- জ্ঞানী কে- বা সত্য ধর্মই বা কি এর সিদ্ধান্তে আসা উচিৎ নয়।

আর যদি ওদের কথাগুলো মেনে নিতে হয় তখন কি অর্থ দাঁড়াতে পারে? ইসলামী শরীয়ত কেবল আলেমদের সম্বোধন করেছে, আপামর জনসাধারণকে নয়! সবার ক্ষেত্রে হুকুম বাস্তবায়ন করতে হবে না! কারণ শরীয়তের প্রবর্তক নবী করিম (দঃ) সমানভাবে সবাইকে আল্লাহর বিধান বুঝাতে সমর্থ হননি! অথচ সঙ্গীন ছিল শরীয়তের কথায় আল্লাহর বান্দাদের বোঝানো, শেখানোর উদ্দেশ্যেই সম্বোধন করা- এমনকি উদাহরণ দিয়ে- ধীর স্থির বক্তব্যে এবং মাসায়েলাসমূহ দলিল প্রমাণসহ প্রাঞ্জল ভাষায় অবতাড়নার মাধ্যমে, যাতে মানুষের তা মাথায় ঢোকে। আর সে বিধান মানবসাধারণের জন্য প্রযোজ্য তো বটেই- এমনকি আল্লাহর এক কথার হুকুম হোক বা হোক বিস্তৃত, আদেশ হোক বা নিষেধ- অকাট্য হোক বা সুসংবদ্ধ অনুমান হোক- যে কোন ধরণের বিধানকে অবরোধে রাখা উদ্দেশ্য হতে পারে না।

ইল্‌মে শরীয়তের বিধান গোপন করা- এ বিষয়ের বৈধতার সমর্থনে কিছুই বর্ণিত নেই রাসূলে আকরম (দঃ) থেকে, কোন দৃষ্টান্তও নেই। কিন্তু ইল্‌মে শরীয়তের উচ্চমার্গীয় রহস্য বা গভীর তত্ত্বজ্ঞানের আসরে দ্বৈত একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়। কিছুর হয়ত প্রকাশ বিভ্রান্তিকর, আর কিছু হয়ত সুস্পষ্ট করা যায়। তাই বলতে পারছি- হাঁ, কতিপয় হাদীস শরীফে এবং কখনোবা পূর্বসুরি মনীষীর মন্তব্যে এমন কিছু গোপন করার প্রেরণা রয়েছে- তবে এসব দ্বারা অনিবার্যভাবে লক্ষ্য হবে ইল্‌মে শরীয়তের ভারী তাত্ত্বিক বা উচ্চমার্গীয় দর্শন।- আসলেই যা একচেটিয়া প্রকাশের বড় বাধা আছে। তা বুঝার ও সারার্থ সইতে পারার জন্য পারঙ্গম উচ্চস্তরের মনীষীর প্রয়োজন।

এ রকম এক আলোচনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে আল্লামা ইবনে গানেম মাকদাসী (রঃ) তাঁর 'হুল্লুর রমুজ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন- ইবনে আব্বাস বলেন- এটা আল্লাহ তাআলার বাণী- "সকল স্তরে তাঁর নির্দেশ নেমে আসে। [সূরা তালাক, আয়াত ১২]- এ বাণী প্রসঙ্গে আমি অবশ্যই জানি। কিন্তু যদি আমি তার মর্মার্থ বলি তবে তোমরা অবশ্যই আমাকে কাফের বলে মন্তব্য করবে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলতেন- "আমি নবীজী (দঃ) থেকে দুই থলে জ্ঞান নিয়েছি, তার এক প্রকার আমি তোমাদের বলেছি, আর অন্যটি যদি তোমাদের শোনাতাম- তবে অবশ্যই তোমরা (এর মর্মার্থ না বুঝে) আমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে।"

হযরত আলী (রঃ) বলেছেন- "এমন তথ্য আমার অন্তরে রয়েছে যদি তা বলি তোমরা আমায় জীবন্ত রাখবে না।"

এ ধরণের অসংখ্য হাদীস শরীফ রয়েছে, আর এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মারিফাতের রহস্য । স্বকীয়ভাবে বাস্তবসম্মত হলেও তা তৃণমূল সাধারণ মানুষের বুঝে আসার প্রশ্নই আসে না। এককথায়- এখানে বিরাজিত রয়েছে খোদায়ী নূরের ঝলক। কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ দুরুহতর, কারো উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও করা যায় না ; হাঁ, তবে এগুলো সুস্পষ্ট কিছু খোদায়ী নিদর্শন বলতে হবে- যা আল্লাহ প্রিয় বান্দাদের সিনা মুবারকে দিয়ে থাকেন। যদি তাঁরা প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনও করেন এবং উজ্জল দৃষ্টান্তের মধ্যস্থতায় ইঙ্গিতও করেন- তবুও তা সবার বুদ্ধিতে ধরবে না। উল্টো এ মর্ম উপলব্ধিতে অক্ষম লোকেরা তার বিপরীত বুঝে বিভ্রান্ত হবে। আর মারিফাত অনুধাবন করে উচ্চমার্গীয় পথে অগ্রগামী হওয়ার সামর্থ্য যাদের নেই, তারাও কিছু না বুঝে। এতে বিভ্রান্ত হবে এবং এমন বিদ্যাগুলো যখন কালামুল্লা শরীফে বা হাদীস শরীফে এসেছে, তখন সেগুলো মুতাশাবিহাত বলে পরিচিত হয়েছে। এই মুতাশাবিহাত প্রসঙ্গে মুসলিম মনীষীদের অনেক অভিমতও রয়েছে। কেউ এগুলো অনুমানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যার পক্ষাবলম্বন করেছেন, কেউ এসবের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করাকে নিরাপদ মনে করেছেন। মুতাশাবিহাত নিয়ে আমি বিশদ বলেছি আমার রচিত "ফি আল মাতালেবুল ওফিয়া ফি ইল্‌মেস সুফিয়া' কিতাবে।

আল্লাহর মারিফাত তত্ত্বে সুউচ্চ পারঙ্গম আওলিয়ায়ে কেরামও মুতাশাবিহাত প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের একটি দল তা ব্যাখ্যা ছাড়া মেনে নেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কোন দল তা অনুমানের ভিত্তিতে অর্থ উদ্ধারের পক্ষে মত দিয়েছেন, আর অন্য একটি দল অর্থ উদ্ধারের তীব্র বিরোধীতা করেন। তবে নিরাপদ অবস্থান হল- বিশ্লেষণ ব্যত্যয়ে এর অন্তস্থিত তত্ত্ব ঠিক আছে বলে মেনে নেয়া। আল্লাহ পাক সুবহানুওয়াতা'লা তো সব বিষয়ে অবগত আছেনই।

সত্যি অর্থে- মারিফাতের ধীমান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি নিন্দনীয় নয় যে- কখনো তারা সাধারণের বুদ্ধির বাইরে কিছু বলে ফেলেন। কেননা তাদের স্তরে পৌঁছে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে কথা বলা তা আল্লাহর সুন্নাত- যা দুনিয়া-আখেরাতে তাঁদের বৈশিষ্ট্যে পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্ত এ মাসায়ালা আমাদের আলোচনায় এল এ কারণে যে- বাদ্যযন্ত্র সহ সেমার মাসায়ালাটি ঐ ইল্‌মে হাক্বীকতের অন্তর্ভূক্ত নয়- যা অবরোধ করা হবে। সেমা হচ্ছে প্রকাশ্য ইল্‌মে শরীয়তেরই অন্তর্ভূক্ত- যা সাধারণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা ওয়াজিব। আর তা উপস্থাপনের যথাযথ উপায় হবে বিস্তৃত আলোচনা যাতে এটি একচেটিয়া হালাল বা হারাম বলা না যায়।

(চলবে)

গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) ও হযরত বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক)-এর অবস্থান : প্রেক্ষিত মাইজভাণ্ডারী তরিকা

❖ সৈয়দ রায়হান ❖

আল্লাহ্‌র হেদায়তী ধারার অনুগ্রহ আবহমান কাল থেকে শুরু হয়ে যুগ যুগ ধরে বহমান, যার দুটি ধারা-এক, নবুয়ত ও দুই, বেলায়ত। আখেরী নবী নুর নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালা নবুয়তী ধারায় হেদায়তী অনুগ্রহ সমাপ্ত ঘোষণা করে বেলায়তী ধারায় হেদায়তী কৌশল উন্মুক্ত করেন। মে'রাজের মাধ্যমে মুক্ত খোদা দিদার বা মিলনের পথ উন্মুক্তির পর নবুয়তী ধারা অব্যাহত রাখার প্রায়োপিক উপযোগিতাও সমাপ্ত হয়। তাই বেলায়তীধারা উন্মুক্তিকরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দ) কর্তৃক বেলায়তপ্রাপ্ত যুগে যুগে খোলাফায়ে রাশেদীন, খলিফাতুর রাসূল, খলিফাতুল মোসলেমীন, আমিরুল মোমেনীন, ইমামুল আউলিয়া, গাউসুল আজম, মুজাদ্দিদ, গাউসে জমান, কুতুবুল আকতাব প্রভৃতি নামে অলি উল্লাহ্‌গণের মাধ্যমে খোদায়ী হেদায়তী ধারার কার্যক্রম অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। অনুরূপভাবে যুগ বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে পূর্ববর্তী বেলায়তী যুগবৃত্তের পরিসমাপ্তিতে নব বেলায়তী যুগ প্রবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে উনবিংশ শতাব্দীতে হিজরী ত্রয়োদশ শতকে আবির্ভূত হন যুগ প্রবর্তক অলি উল্লাহ হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক)।

হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক) মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সত্তা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ)-এর বেলায়তে ওজমার (সুন্নতে ওজমা) দেহাকার স্বরূপ আবির্ভূত হয়ে যুগের প্রয়োজনে সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন বেলায়তী যুগের সূচনা করেন যার নাম 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী' এবং পূর্ববর্তী বাঁধাধরা নীতিযুক্ত বেলায়তী যুগবৃত্ত 'বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী'র সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দ)-এর জ্বিল বা পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবিরূপে রসূলে পাক (দ)-এর রূপসমূহের মধ্যে একটি সর্বোত্তম রূপ। বলাবাহুল্য, নবুয়ত রসূলে পাক (দ)-এর জাতে-পাকে খতম বা শেষ হয়েছে। আর হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক) হলেন রসূলে পাক (দ)-এর বেলায়তে ওজমারই বাহ্যিক প্রকাশ হিসেবে 'জিল্লে মোহাম্মদী' সাবস্ত্যক্রমে "রাহমাতুল্লিল আলামীন জিল্লুল আমান"। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দ) হলেন সত্তাগতভাবে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' এবং হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক) হলেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন (দ)' এর বিকাশস্থল। তাই খলিফায়ে গাউসুল আজম মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক) বলেন, "আল্লাহ্‌পাকের অশেষ প্রশংসা, যেহেতু গাউসুল আজম তাঁহারই খাস মাহবুব, নৈকট্যপ্রাপ্তদের পথপ্রদর্শক, কামেল ব্যক্তিগণের পুরোধা, বিদ্যার্থীদের জ্ঞান কেন্দ্র, খোদা অন্বেষণকারীদের দিগ্‌দর্শন, দৃঢ় বিশ্বাসীগণের হিদায়াতের উৎস আল্লাহ্‌পাকের নিদর্শনাদির একটি অত্যুজ্জল নিদর্শন। যিনি উভয় জগতের সর্দ্দার, অলি আল্লাহ্‌দের মুকুট, বিশ্বের হিদায়াতকারী এবং আল্লাহ্‌র বন্ধুদের গৌরব, এ যুগের সৃষ্টির সেরা মানব, প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য রহমত ও শান্তির ছায়া।" (তোহফাতুল আখ্‌ইয়ার, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১৫)

হযরত গাউসুল আজম মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক) ১২৪৪ হিজরীতে ধরাধামে শুভাগমন করে ১২৭০ হিজরীর কোন এক শুভক্ষণে আনুষ্ঠানিক বায়াত গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাবাহিকতাক্রমে ১২৮২ হিজরী সনের কোন এক শুভ মুহূর্তে তাঁর অপূর্ব ও অতুলনীয় বেলায়তী ক্ষমতা ও কামালিয়তের প্রথম প্রকাশ ঘটে। যার ফলে গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক)-এর বেলায়তী শান ও কামালিয়তের নিকট আত্মসমর্পণপূর্বক স্ব স্ব কামালিয়ত হাসিলের উদ্দেশ্যে দূর দূরান্ত হতে খোদাপথযাত্রীদের আগমন ঘটতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আগত খোদা পথের পথিকদের অবারিত স্বর্ণাধারার মত আধ্যাত্মিক অনুগ্রহকণা বিতরণের লক্ষ্যে ও যুগোপযোগী খোদায়ী হেকমত সমৃদ্ধ হেদায়তী ধারা 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী' এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র পানে আহ্বানের উদ্দেশ্যে এক অনন্য তরিকা প্রবর্তন করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের গ্রামের নামানুসারে 'মাইজভাণ্ডারী তরিকা' নামে স্বীকৃত ও সুপরিচিত। সুতরাং, গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) হলেন মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তক, প্রধান নিয়ন্ত্রক ও প্রাণপুরুষ। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র হেদায়তী ধারা বিস্তারের লক্ষ্যে স্থাপিত মাইজভাণ্ডারী তরিকার আহ্বানকে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর নিমিত্তে গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) তাঁর মুরিদ ও অনুসারীদের মধ্য থেকে কতেক বাছাইকৃত

ব্যক্তিত্বকে স্বীয় আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্বে বরিত করে বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন করে তরিকার প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপ প্রতিষ্ঠিত করেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন স্থানে শূন্যতার সৃষ্টি হলে হযরত আকদছ (ক) স্বয়ং আদেশ, নির্দেশ ও আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন, যার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী তরিকার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা হযরত আকদছ (ক) স্বীয় পবিত্র হাতে সম্পন্ন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও তাঁর এরূপ কর্মকাণ্ড কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়নি, বরঞ্চ আধ্যাত্মিকভাবে ও বাতেনী হেদায়তী ধারার পন্থা অনুসারে এ কার্য সম্পন্ন হয়েছিল। তবে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে হযরত আকদছ (ক)-এর কতেক রূপক কালাম বা বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন–মাইজভাণ্ডারী তরিকায় সেমা বা আধ্যাত্মিক গান-বাজনাকে একটি হেদায়তী কৌশলরূপে চর্চার ক্ষেত্রে হযরত আকদছ (ক) কাউকে কাউকে বলতেন, "আমার আমিন মিঞার দপ্তর খানায় গিয়া বস।" (সূত্র : বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ: ১৩৩)

অনুরূপভাবে মাইজভাণ্ডারী তরিকার নীতি আদর্শ সম্পর্কে ও হযরত আকদছ (ক)-এর বিভিন্ন 'মকালা' বা পুণ্যবাণীসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যেমন–"আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ;" "আমার ছেলেরা সব সময় রোজা রাখে;" "আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারী আছে;" " ফেরেশতা কালেব বনে যাও;" "এখানে আসিও না। এখানে হাওয়া দাফন করা হইয়াছে। ইহা বাবা আদমের কবর"; "কবুতরের মত বাছিয়া খাও। হারাম খাইওনা, নিজ সন্তান সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর;" "দুনিয়া মোছাফেরীর জায়গা, এখানে আড়ম্বরের দরকার কি;" প্রভৃতি। (সূত্র : বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ: ৮২/৮৩/৯৪/৯৮)। তাছাড়া গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্বে বরিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে জিল্লে মোহাম্মদী সাব্যস্তকৃত হিসেবে তিনি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দ)-এর বাতেনী শাসন পদ্ধতির নীতি তথা রাসূলে পাক (দ)-এর পবিত্র বক্ষস্থলের (ছদর মোবারক) আদলে ও আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিত্তিতে উক্ত কার্য সম্পন্ন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। কেন না, হযরত আকদছ (ক) স্বয়ং কালাম করেন, "আমার বারটি সেতারা, বারটি বুরুজ ও বারটি কাছারী আছে" "এবং "আমার চারটি কুরছি, চারটি মজহাব ও চারিটি ইমাম আছে।" (সূত্র : বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ: ৮৩)। উক্ত কালামসমূহ হযরত আকদছ (ক)-এর জিল্লে মোহাম্মদীর পরিচায়ক ও সকল ধরণের বেলায়তে ওজমার প্রমাণ স্বরূপ। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী (র) তাঁর 'ফতহুল আজিজ' গ্রন্থে রাসূলে করিম (দ)-এর বক্ষ মোবারকের পবিত্র বারো কক্ষ সম্বন্ধে বিবৃত করেন, "উক্ত বারো মজলিশের প্রথম মজলিশে অতি বড় ও সম্মানিত এক মহান বাদশাহ বসে আছেন, দ্বিতীয় মজলিশে একজন মহান প্রজ্ঞাবান মো'মেন হাকিম (হেকিম) স্থলাভিষিক্ত, তৃতীয় মজলিশে এক মহান কাজী বা বিচারক বিদ্যমান, চতুর্থ মজলিশে একজন মোজাদ্দেদ মুফতি উপস্থিত যিনি উদ্ভূত দ্বীন-দুনিয়ার সমস্যার অকাট্য সমাধান কোরআন হাদিস হতে বাহির করে দিতেছেন, পঞ্চম মজলিশে একজন মোহতাছিব বা পাপ কার্য্যের প্রতিরোধকারী ও পাপীর শাস্তি প্রদানকারী অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে আসীন, ষষ্ঠ মজলিশে একজন ক্বারী সুমধুর সুরে কোরআন তেলাওয়াত করছেন, সপ্তম মজলিশে একজন শীর্ষস্থানীয় আবেদ সমাসীন, অষ্টম মজলিশে একজন মহান অলী আল্লাহ্তায়ালার জাত-ছিফত ও কাজসমূহের রহস্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী এবং ছলুক ও তাসাউফ সম্বন্ধীয় ত্বরীকতের বহু এলম সম্বন্ধে কামেল বসে আছেন, নবম মজলিশে একজন ওয়াজ নসিহতকারী মিম্বরের উপর বসে ওয়াজ করছেন, দশম মজলিশে একজন উলীল আমর আলী আছেন, একাদশ মজলিশে একজন হাদীয়ে কামেল মোর্শেদ ছাহেবে ত্বরীকত বসে আছেন এবং দ্বাদশ মজলিশে একজন মাহবুবে নাজনীন চাঁদের মত বরং প্রাণের কেবলা কা'বা সদৃশ বসে আছেন যিনি আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র সৌন্দর্যের জ্যোতি তাঁর মোবারক শরীরে রওশন করেছেন।" (সূরা আলাম নাশরাহ এর তাফসীর, তাফসীরে ফতহুল আজিজ; সূত্র : জলওয়া-এ-নুরে মোহাম্মদী, মৌলানা আবদুচ্ছালাম ঈসাপুরী)। তাই রাসূলে পাক (দ)-এর প্রতিনিধিত্বে বরিত ও জিল্লে মোহাম্মদী (দ) রূপে গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক)-এর 'বারটি কাছারী' বা কক্ষ থাকার সত্যতা প্রতিপাদিত হয়। যে কারণে হযরত আকদছ (ক)-এর শানে মুফতীয়ে আজম আল্লামা ফরহাদাবাদী (ক) বলেন, "আমার মোরশেদে মোয়াজ্জাম, শাইখে মোকাররম, যিনি সমস্ত কামালিয়ত ও ফজিলতে রাব্বানীর সমাবেশকারী এবং ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র, যাঁর প্রভাব অলৌকিক ঘটনাবলী ও কেরামতসমূহের মধ্যস্থতায় সর্বময় ব্যাপ্ত, তাঁর অর্ন্তনিহিত স্বরূপ পবিত্র তূর পর্বত সৃদশ চেহারাতে বা মুখমন্ডলে প্রস্ফুটিত। তাঁর মেজাজ শরীফ বা ভাবভংগী নুর বিশেষ। তাঁর গুণাবলী হতে দোষ বিবর্জিত 'ফয়জ' বিকীর্ণ হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বা কাশ্ফ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মে'রাজকালে আল্লাহ্তালার সাক্ষাৎ দর্শনে অবগত বস্তু, তাঁর মোশাহেদা বা দর্শন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মে'রাজী ছায়রের পরিদৃষ্ট রহস্যাবলীর চাক্ষুষ জ্ঞান। তাঁর গুণাবলী আল্লাহ্তালার গুণাবলী হতে অর্জিত। তিনি আল্লাহ্র জগতসমূহে গাউসুল আজমরূপে নিয়োজিত। তাঁর পবিত্র নাম জনাব শাহ মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক), আল্লাহ্ তাঁর রহস্যকে পবিত্র করুন।" (আত্তওজিহাতুল বহিয়্যাহ্ ফি তরদীদে মা ফিত্তানকিহাতিছ ছুন্নিয়াহ্, তৃতীয় প্রকাশ ২০১১ ইং, পৃঃ ১৪/১৫) সুতরাং, গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) সময়কালে রাসূলে করিম (দ)-এর পবিত্র বক্ষস্থলের বারো কক্ষের আদলে তাঁর আধ্যাত্মিক 'বারো কাছারী' বা মঞ্জিলে বা কক্ষে বারোজন সেতারাসদৃশ কামেলে মোকাম্মেল ব্যক্তিত্বকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বে বরিত করেন। যে কারণে গাউসুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আকতাব হযরত বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক) কে গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বে অভিষিক্ত করে মাইজভাণ্ডারী তরিকার দ্বাদশ কক্ষে বিরাজিত প্রেমাস্পদ ও মহান পুরুষ (মাহবুবে নাজনীন) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি রাসূলে পাক (দ)-এর পবিত্র বক্ষ স্থলের দ্বাদশ কক্ষে বিরাজিত প্রেমাস্পদের সন্ধানে অনুগৃহীত হন যেহেতু গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) স্বয়ং রাসূলে করিম (দ)-এর বেলায়তী শানের অবয়বস্বরূপ। এ কারণেই হযরত আকদছ (ক) স্বয়ং তাঁর নাতিদ্বয় সৈয়দ মীর হাসান ও সৈয়দ দেলাওর হোসাইন এর আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, "রাসূলুল্লাহ্র দুইজন নাতি হাছনাইনকে চিন না? আদবের মোকাম। আদব করিও।" (গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, দ্বাদশ প্রকাশ, পৃঃ ১৮১)

গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক)-এর অপর বাণী, "আমার চারিটি কুরছি, চারটি মজহাব ও চারিটি ইমাম আছে" এর বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, কুরছি দ্বারা হযরত আকদছ (ক) এর চার প্রকারের বেলায়ত যথা-বেলায়ত বিল আছালত, বেলায়ত বিদ দারাছাত, বেলায়ত বিল বেরাছত, বেলায়ত বিল মালামত এর সর্বোচ্চ স্থান অধিকারের ইঙ্গিতবাহী ও তিনি যে প্রকৃত পক্ষে আওলাদে রাসূল তাঁর প্রমাণও বহন করে যেহেতু 'চার কুরছি' রাসূলে পাক (দ)'র বংশ পরিচয় যথা-আবদুল্লাহ, আবদুল মোতালেব, হাশেম, আবদে মোনাফ সম্পর্কিত রূপক উক্তি। আর 'চারটি মজহাব' উক্তি দ্বারা হযরত আকদছ (ক) নাজিয়া দল মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত মর্মে স্বীকৃতি দেন আর নাজিয়া দলের চার মজহাব যথা-হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী মজহাব অন্তর্ভুক্ত, যদিও হযরত আকদছ (ক) হানাফী মজহাবের অনুবর্তী ছিলেন। আর 'চারটি ইমাম' উক্তি দ্বারা হযরত আকদছ (ক)-এর ইমামুল আউলিয়া ও খাতেমুল আউলিয়া (আউলিয়া বা ইমামগণের সনদদাতা) হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং বাতেনী শাসন পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে তাঁর প্রতিনিধিত্বে বরিত চারজন যুগশ্রেষ্ঠ আউলিয়া বা ইমামের প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) 'পাক জীবনের অবশেষে স্বর্গীয় কর্তব্যবশে' গাউসুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাভাণ্ডারী (ক) কে উক্ত চারজন ইমামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে বিল বেরাছত গাউছিয়তের অধিকারী ও আজমিয়তের শানে মোতাজ্জাল্লা বা বিকশিত হতে দেখা যায়। যেরূপ বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী যুগে হযরত গাউসুল আজম জিলানী (ক)-এর সময়কাল সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আজম শাহ্সূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক) বলেন, "সেই সময়ে সোলতানুল হিন্দ হযরত গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিস্তি (ক) কে কুতুবুল আকতাব বিল আছালত এবং তাঁহারই মধ্যস্থতায় গাউছিয়াত ফয়জপ্রাপ্ত হইয়া বিল বেরাছত গাউছিয়তের অধিকারী ও আজমিয়তের শানে মোতাজাল্লা বা বিকশিত হতে দেখা যায়। (ওফাত ৬৩৩ হিজরী)" (বেলায়তে মোত্লাকা, পৃঃ ৫৬) তাই মুফতীয়ে আজম আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ক) হযরত গাউসুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আকতাব বিল আছালত শাহ্সূফী সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক)-এর শানে লিপিবদ্ধ করেন, "অতঃপর যখন মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজের মাহবুব হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন, তাঁর বেলায়তের মসনদে ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তাঁরই বংশের উত্তম ও সুযোগ্য সন্তান কোদওয়াতুল ওয়াছেলীন তথা আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অগ্রণী, কুররাতুল আরেফীন তথা খোদা পরিচিতি লাভকারীদের চক্ষু জুড়ানো শীতলতা, মাহবুবুল আশেকীন তথা খোদা প্রেমিকদের প্রেমাস্পদ, মাতলুবুল মোশতাকীন তথা খোদা আকাংখাকারীদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য, ছেরাজুস সালেকীন তথা খোদার পথের পথিকদের আলোকবর্তিকা, তাজুত তোয়ালেবীন তথা খোদা অন্বেষণকারীদের তাজ বা মুকুট; তাঁর বেলায়তের প্রভাব প্রামাণ্য ও স্পষ্ট, আসরারুহ খাপিয়াতুল ইরফান তথা তাঁর রহস্যাদি খোদা পরিচয়ের সহায়ক, তাঁর ফয়েজ খোদা প্রদত্ত, তাঁর সাহর্য্য খোদার সাহচর্য্য সদৃশ, তাঁর তছাররোফাত তথা প্রভাব পবিত্র কোরআন মোতাবেক, তাঁর ভাবভঙ্গীসমূহ খোদা পরিচয়ের সহায়ক; যে ব্যক্তি তাঁকে দেখেছেন, উপরন্তু তিনি দেখেছেন নাইরুল আময়া তথা উর্ধ্বাকাশের রাশিচক্র এবং বুরুজসমূহের উপর তাঁর পবিত্র পদাংক উর্ধ্বাকাশে সদা সর্বদা বিরাজমান; সমসাময়িকদের হৃদয় থেকে 'জালালুল

গাওয়াইয়া' তথা বেঈমানী ও গোমরাহীন অন্ধকার বিদুরীতকারী। এ জামানার কুতুবুল আকতাব, মাওলায়ে আহলে ইরফান, শাহ ছৈয়দ গোলামুর রহমান (ক), আল্লাহ্তালা তাঁর বরকতে আমাদের ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করুক।" (আত্তওজিহাতুল বহিয়্যাহ, তৃতীয় প্রকাশ, পৃঃ ১৫/১৬)

মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীদের গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) ও হযরত বাবাজান কেবলা মাইজভাণ্ডারী (ক)-এর অবস্থান ও শানে আজমত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ হলেও ধারণা নেওয়ার জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস গাউসে পাক কবুল করুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গাউসুল আজম বিল বেরাছত হযরত মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক) বাবা ভাণ্ডারী ১২৭০ বাংলা ২৭ আশ্বিন (মোতাবেক ১০ অক্টোবর ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জমাদিউসসানি ১২৮২ হিজরী) সোমবার সকালে ধরাধামে শুভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সপ্তম দিবসে গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) তাঁর নাম রাখেন 'গোলাম রহমান'। (সূত্র : মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা আল্লাহ্তালার নৈকট্য লাভের সহজপন্থা, শাহজাদা সৈয়দ লুৎফুল হক, তৃতীয় সংস্করণ ২০১০ইং পৃঃ ১৮১) আরো উল্লেখ্য যে, গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক)-এর কামালিয়তের ও বেলায়তী শানের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটেছিলো ১২৮২ হিজরী সনে। তাই সর্বসম্মতিক্রমে আশেকভক্ত ও মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারীগণ এ দু'মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক) ও গাউসুল আজম বিল বেরাছত কুতুবুল আকতাব শাহসূফী সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক) নামে সম্বোধন করে থাকেন আর এ সম্বোধন সর্ববাদীসম্মত। তাছাড়া অলি উল্লাহ্দের সম্বোধনের বিষয়টি বৃহত্তর ঐক্যমঞ্চ 'মাইজভাণ্ডারী তরিকতপন্থী' হিসেবে একতাবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন যুক্তিসঙ্গত বাধা মর্মে সচেতন মানুষের নিকট প্রতীয়মান হয় না। আল্লাহ্তালা কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন, "আমরা রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৮৫)। সুতরাং গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) ও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক) যে নিজ নিজ যুগে শ্রেষ্ঠ আউলিয়া এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আল্লাহ্র বাণী রয়েছে, "এ রসূলগণের মধ্যেও একের উপর অপরের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে" (সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৩)। অতএব, গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) ও গাউসুল আজম বিল বেরাছত হযরত বাবাজান কেবলা (ক) 'দুই মিলি হক এক নাই কিছু পরথেক' যেমন সত্য তেমনি উভয়ের মাঝে একের উপর অন্যের মর্যাদাগত শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ও রাসূলে করিম (দ) প্রদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব। যারা এটা স্বীকার করতে চান না, তারা আল্লাহ্র বাণীর মর্মার্থ বুঝতে পারেন না।

আর পূর্বে যা উল্লেখ করেছি সে মোতাবেক এ দু'মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্বোধনে কোন ধরণের বিতর্কের অবকাশ নেই, কেননা উক্তরূপ সম্বোধন আমাদের পূর্বসুরী কামেলে মোকাম্মেল অলি উল্লাহ্গণ প্রদান করেছেন; যেমন–মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচক শাহ্সূফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক), গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) কে "গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী" ও হযরত গোলামুর রহমান বাবাজান কেবলা (ক) কে "গাউসুল আজম বিল বেরাছত" হিসেবে সম্বোধন করেছেন। অনুরূপ ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা (র) তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে আজিজ' এ গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) কে "গাউসুল আজম ও কুতুবুল আকতাব" এবং হযরত বাবাভাণ্ডারী (ক) কে "বাহরে ছানী গাউসুল আজম" লকব ব্যবহার করেছেন (পৃ. ৪০/৪১)। এতদ্ভিন্ন খলিফায়ে গাউসুল আজম শাহ্সূফী সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী বর্মকবুল (ক) তাঁর 'আয়নায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসুল্লাহিল আজম মাইজভাণ্ডারী' গ্রন্থে গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক)-এর শানে "খলিফাতুল্লাহ ও গাউছুল্লাহিল আজম" লকব ব্যবহার করেছেন এবং হযরত বাবাজান কেবলা (ক)-এর শানে "খলিফাতুরাসূলুল্লাহ" লকব প্রয়োগ করেছেন। (পৃ. ১/২)

পরিশেষে একথা বলতে চাই যে, বাহ্যিক আগ্রাসন ও হামলা ও ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সকল ধরণের বিভ্রান্তি ও বিতর্ক থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে বর্তমান প্রজন্মের উচিত হবে পূর্বসুরীদের নিদর্শন ও আদর্শকে পাথেয় ধরে সেই অনুযায়ী মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুশীলনে ব্রতী হয়ে এ তরিকার আহ্বানকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করা। আর যদি কেউ পূর্বসূরীদের অনুসরণের নামে নিজের সাথে প্রতারণা করতে চান, তাদের উচিত হবে আত্মসংশোধনের সম্মিলিত প্রয়াসে শামিল হওয়া এবং ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মাইজভাণ্ডারী তরিকার মূলনীতি ও আদর্শকে তুলে ধরা, যার মাধ্যমে মাইজভাণ্ডারী তরিকতপন্থীদের বৃহত্তর ঐক্যমঞ্চ বিনির্মাণ করা সহজ হবে।

আল্লাহ্ আমাদের গাউসুল আজম হযরত আকদছ (ক) ও গাউসুল আজম বিল বেরাছত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা (ক)-এ দুই মহান সত্তার উসিলায় ও তাঁদের ফয়েজ রহমত বরকত ও নূরানী নজরে করমের ছদকায় দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের সর্বোচ্চ সফলতা দান করুন। আমিন। বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালীন (দ)।

হযরত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ বাক্বির (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

॥ কাজী মুহাম্মদ ইব্রাহীম ॥

হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন রাসুল বংশের এক উজ্জ্বল প্রদীপ এবং নবুয়তের একটি নির্যাস। অনেক সদগুণের আধার ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত তাবেয়ী, ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির। এছাড়াও কাদেরীয়া আলীয়া শাজরা অনুসারে তিনি কাদেরীয়া ত্বরীকার উর্ধ্বতন ১৪তম শাইখ এবং কাদেরীয় মাইজভান্ডারীয়া শাজরা মতে মাইজভান্ডারীয়া তরীকার উর্ধ্বতন ৩৩তম শাইখ ছিলেন।

পরিচয় : তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু জাফর, উপাধি বাক্বির, শাকির ও হাদী। পিতার নাম হযরত যয়নুল আবেদীন আলী এবং দাদার নাম হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। মাতার নাম হযরত ফাতেমা এবং উপনাম উম্মে আবিদা, যিনি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কন্যা।

উপাধির কারণ : তাঁকে 'বাক্বির' বলা হয়। কারণ 'বাক্বির' অর্থ বিদীর্ণ কারী। তিনি জ্ঞানের উপরস্তর বিদীর্ণ করে গভীর স্তরে পৌঁছেছেন এবং অনেক বিষয়ে পারদর্শী আর ইজতাহিদ করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁকে 'শাকির' বলা হয়। কারণ 'শাকির' অর্থ শোকরিয়া জ্ঞাপনকারী। তিনি বেশী বেশী আল্লাহর নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতেন । তাঁকে 'হাদী' ও বলা হয়। কারণ 'হাদী' অর্থ পথপ্রদর্শক। তিনি পথভ্রষ্টদের সঠিক পথ দেখাতেন।

জন্ম : তিনি ৫৬/৫৭ হিজরীতে ৩ সফর মতান্তরে রজব মাসে রোজ মঙ্গলবার মতান্তরে শুক্রবার দিনের বেলায় মদীনা শরীফে জন্ম গ্রহন করেন। ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৩ বছর আর পিতার ইন্তিকালের সময় ৩৮ বছর।

জ্ঞানার্জন : শৈশব থেকেই তিনি জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। এ জন্য তিনি ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকাহ এবং ইলমে তাফসীর অর্জন করে এসব বিষয়ে পারদর্শী হন। তিনি মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস এবং মুফাসসির হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত যয়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু থেকে 'ইলমে তাসাউফ' অর্জন করেন এবং তাঁর পিতাই তাঁর শাইখ ছিলেন। তাঁর উস্তাদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

হাদীস বর্ণনা : তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর স্বীয় পিতা হযরত যয়নুল আবেদীন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত জাবের, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন জাফর, হযরত সায়ীদ ইবেন মুসাইয়ার, হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আয়েশা, হযরত সামুরা বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে মুরসাল হিসাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর নিকট থেকে ও অনেক তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর স্বীয় ছেলে হযরত জাফর সাদেক, হযরত আত্বা বিন আবী বারাহ, হযরত আরাজ, হযরত আমর বিন দীনার, হযরত আবু ইসহাক আস-সবীয়ী, হযরত ইমাম যুহরী, হযরত ইহইয়া বিন আবু কাসীর, হযরত আমর বিন দীনার, হযরত রবীয়াতুর রায়, হযরত লাইস বিন আবু সুলাইম, হযরত ইবনু জুরাইজ, হযরত কুবরা বিন খালিদ, হযরত হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ, হযরত আমশ, হযরত মুখাওয়াল বিন রাশিদ, হযরত হারব বিন সরাইজ, হযরত কাসিম বিন ফদল, হযরত ইমাম আওযায়ী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম প্রমুখ বর্ণনা কারীগণ উল্লেখযোগ্য।

বৈবাহিক জীবন : তাঁর স্ত্রী ছিলেন দুজন । এঁরা হলেন হযরত উম্মে ফরওয়া বিনতে কাসিম, যিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বংশধর এবং 'সক্বাফিয়্যাহ' যিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর বংশধর, তাঁর পাঁচ সন্তান, এবং তিন কন্যা ছিলেন। সন্তানগণ হলেন- হযরত ইমাম জাফর সাদেক আলাইহির রাহমা, হযরত আব্দুল্লাহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত উবাইদুল্লাহ, এবং হযরত আলী আলাইহিমুর রাহমা। কন্যাগণ হলেন- হযরত উম্মে সালমা, হযরত যয়নাব এবং হযরত উম্মে জাফর আলাইহিমার রহমাহ।

শিক্ষাদান : তিনি অনেক হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনেক ছাত্র ছিল। তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইজতিহাদ করে মাসআলা বের করতেন এবং ফতোয়া দিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে ফতোয়া দিয়েছেন। ইমাম নাসায়ীসহ অনেকে তাঁকে মদীনার তাবেয়ী ফিকাহবিদদের অন্যতম হিসেবে গণনা করেছেন। তিনি যখন তফসীর করতেন, তখন বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতেন।

গুণাবলী : তিনি অনেক পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার ছিলেন। তিনি ছিলেন বিনয়ী, ধৈর্য্যশীল, নবুয়তের নির্যাস, সমরাস্ত্র পরিচালনায় পটু, ঝগড়া-ঝাঁটি বিমুখ। তিনি আল্লাহর নিকট অত্যাধিক কাঁদতেন আর অশ্রুপাত করতেন।

অধ্যাত্মিক সাধনা : তিনি 'ইলম' এবং আমলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন । তিনি আল্লাহর যিকির করতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন । তিনি প্রতিদিন দেড়শ রাকাত নফল নামায পড়তেন। তাঁর কপাল ও নাকে সিজদার সামান্য চিহ্ন ছিল।

ইমামত : তিনি তাঁর স্বীয় পিতা হযরত যয়নুল আবেদীনের (আলাইহি রাহমাহ) ইন্তিকালের পর ৩৮ বছর বয়সে ইমাম হন এবং ১৯ বছর পর্যন্ত ইমাম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কারামত : হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর অসংখ্য কারামত রয়েছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি কারামত উল্লেখ করা হল :

* হযরত হুবাবাহ আলাইহির রাহমাহ একদিন হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর নিকট বিলম্ব করে আসলেন। তিনি হযরত হুবাবাহ আলাইহির রাহমাকে বিলম্ব করে আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "আমার মাথায় শ্বেতকুষ্ঠ হয়েছে।" এ কথা শুনে ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- "আমাকে ঐ স্থান দেখাও।" হযরত হুবাবাহ আলাহির রাহমাহ ঐ স্থান তাঁকে দেখালে, তিনি সেই স্থানে তাঁর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলে তাঁর শ্বেতকুষ্ঠ ভাল হয় এবং মাথার সকল চুল কালো হয়ে যায়।
* তাঁর এক অনুসারী মক্কা শরীফ অবস্থান কালে তাঁর ইচ্ছা জাগল যে, হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে সাক্ষাতের। তিনি বলেন, "এরপর আমি মদীনা শরীফে গেলে প্রবল বৃষ্টির কারণে আমার সর্দি হয়ে যায়। মধ্যরাতে আমি তাঁর ঘরে পৌছলাম এবং চিন্তা করতে লাগলাম যে, তাঁকে ডাকব নাকি সকাল পর্যন্ত অবস্থান করব। একথা ভাবতে থাকলে হঠাৎ ভিতর থেকে আওয়াজ আসল, হে দাসী- অমুক ব্যক্তির জন্য দরজা খুলে দাও; কেননা আজ রাতে তাঁর খুব বেশী সর্দি হয়েছে। সে এসে দরজা খুলে দিলে আমি ভিতরে প্রবেশ করি।"
* তাঁর এক অনুসারী বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে স্বাক্ষাত করার জন্য তাঁর দরজায় গিয়ে করাঘাত করলে এক সুশ্রী দাসী এসে দরজা খুলে দিল। তাকে আমার খুব পছন্দ হল। আমি তার বুকে হাত দিয়ে বললাম, "তোমার মলিককে গিয়ে বল, জনৈক ব্যক্তি আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় দরজায় অপেক্ষামান।" ভিতর থেকে আওয়াজ আসল, "ভিতরে চলে আসুন, আমি আপনার অপেক্ষায় রয়েছি।" আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম, "হুজুর আমার পাপের কোন ইচ্ছা ছিল না।" তিনি বললেন, "তুমি সত্য বলেছ; কিন্তু তুমি এটা মনে করনা যে, আমি দেয়ালের বাইরের অবস্থা দেখি না, যেভাবে তোমরা দেখনা। দেয়াল আমার জন্য অন্তরায় নয়। যদি অন্তরায় হয় তাহলে আমার এবং তোমাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তুমি আজকের মত আচরণ আর করো না।"
* হযরত আবু বছীর আলাইহির রাহমাহ বলেন- "আমি অন্ধ ছিলাম। একদিন আমি হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর দরবারে গিয়ে তাঁকে বললাম, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দীনের রক্ষক নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহিস সালাম কি সকল নবীর ওয়ারিছ নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ- রাসুলল্লাহ সাল্লাহল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁদের ইলমের ওয়ারিছ। আমি বললাম, ঐ ইলমের উত্তারাধিকারী কি আপনি হন নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি বললাম, আপনার কি মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা করার এবং মাদারজাত অন্ধ ব্যক্তিকে ভাল করার ক্ষমতা আছে? আপনার পরিবারের লোকেরা কী আহার করে আর কী অবশিষ্ট রাখে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নির্দেশে বলতে পারি। তুমি আমার সামনে এসে বস। অতঃপর আমি সামনে এসে বসলাম। তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার চেহারায় বুলিয়ে দিলে আমার চোখ এমন ভাল হল যে, আমি আসমান এবং জমীনের সব দেখেছি। এরপর তিনি পুনরায় তাঁর হাত মোবারক আমার চেহেরার উপর বুলিয়ে দিলে আমার চোখ আগের অবস্থায় ফিরে আসল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন; তুমি অন্ধ থাকলে বিনা হিসেবে জান্নাতে যেতে পারবে আর চোখের আলো ফিরে পেলে হিসাব দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে। তুমি কোনটি চাও? আমি বললাম, আমি অন্ধই থাকতে চাই; এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে যেতে চাই।"
* তাঁর এক অনুসারী বর্ণনা বলেন, একদিন হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি ও তাঁর সাথে ছিলাম। কিছুদূর যেতে না যেতে তাঁর সাথে দুইজন ব্যক্তির সাক্ষাত হলে তিনি বলেন- এ দুজন চোর, তাদেরকে ধর এবং বেঁধে রাখ। তাঁর অনুসারীবৃন্দ তাদেরকে ভাল করে বেঁধে রাখলেন। তিনি তাঁর নির্ভরযোগ্য এক অনুসারীকে বললেন, তুমি অমুক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে যা পাও নিয়ে আস। তিনি সেখান থেকে দুই সিন্ধুক সম্পদ নিয়ে আসেন। হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন। এক সিন্ধুকের মালিক এখানে উপস্থিত আর অন্য

সিন্দুকের মালিক এখানে নেই। বর্ণনা কারী বলেন, আমরা যখন মদীনা শরীফ পৌছলাম তখন বিভিন্ন ব্যক্তি এ সিন্দুকের মালিকানা দাবী করলে হযরত ইমাম বাকের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ সিন্দুক এর হক্বদারকে হস্তান্তর করার পর চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিলে তাদের হাত কাটা হয়। হাত কাটা-চোরের একজন বলল, আল্লাহ্ তায়ালার শোকরিয়া এজন্য যে, একজন আওলাদে রাসূলের সামনে আমার হাত কাটা হয়েছে। অতঃপর হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, তুমি তাওবা কর; কেননা একবছর পর তুমি মরে যাবে। সে তাঁর হাতে তাওবা করার পূর্ণ একবছর পর মারা গেল। এ ঘটনার তিন দিন পর দ্বিতীয় সিন্দুকের খৃষ্টান- মালিক আসলে তিনি বললেন, "তোমার এ সিন্দুকে এক হাজার দীনার তোমার এবং বাকী সম্পদ অন্যের।" অতঃপর সেই ব্যক্তি তাঁকে বললেন, দয়া করে তার নাম বলে দেন, তিনি বললেন- "তার নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রাহমান, যিনি অত্যন্ত সৎ, নেকার, দানশীল এবং যথাসময়ে নামায আদায় কারী।" তিনি এখন নামাজের জন্য অপেক্ষা করছেন। দ্বিতীয় সিন্দুকের খৃষ্টান মালিক হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কথা শুনে বললেন, নি:সন্দেহে আল্লাহই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য প্রভু এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাঁর খাস বান্দা এবং রাসূল। এ কথা বলে সে ঈমান গ্রহণ করল।

বাণী : হযরত ইমাম বাক্বির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অসংখ্য মূল্যবান বাণী রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

তিনি তার স্বীয় সন্তানকে বলতেন, "অলসতা ও অস্থিরতা থেকে দূরে থাক। কেননা এদুটি মন্দ কাজের দ্বার। তুমি আলস হলে কর্তব্য আদায় করতে ব্যর্থ হবে আর অস্থির হলে ন্যায়ের উপর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে না।" তিনি বলেন, "তিনটি কাজ অত্যন্ত কঠিন; যেমন সর্বদা আল্লাহর স্মরণ করা, নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা এবং ভাইকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করা।" তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহকে আহবান কর। দোয়ার মাধ্যমে তাকদীর পরিবর্তন হয়। মহান রাব্বুল আলামীন এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল তাঁর নিকট বান্দার প্রার্থনা করা।" পেট বা লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখার চেয়ে কোন উত্তম ইবাদত নেই। কোন ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ হবার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের দোষ না ধরে অন্যের দোষ ধরার মধ্যে লিপ্ত থাকা এবং অন্যকে অসাধ্য কাজের নির্দেশ দেয়া ও তার পার্শ্ববর্তী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে অনর্থক কষ্ট দেয়া। তিনি বলেন, যার অন্তরে দীনের একনিষ্ঠতা প্রবেশ করেছে, তা তাকে ব্যস্ত রাখবে অন্যবস্তু হতে। এ দুনিয়াটা একটি বাহন, যার মধ্যে আরোহন করেছ অথবা একটি কাপড়, যা তুমি পরিধান করেছ বা একটি রমনী, যাকে তুমি ভোগ করেছ। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির অন্তরে যতটুকু পরিমাপ অহংকার প্রবেশ করে, ততটুকু পরিমাণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পায়। তিনি বলেন, ঈমানদার এবং বেঈমান সকলের উপর বজ্রপাত হয় কিন্তু আল্লাহর যিকির কারীর উপর বজ্রপাত হয় না।

ওফাত : তিনি হিশাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ১১৪ হিজরী মতান্তরে ১১৩ বা ১১৭ বা ১১৮ হিজরী সনে রবিউস সানী মাসে মতান্তরে ২৩ সফর বা ৭ জিলহজ্ব মাসে রোজ সোমবার ওফাত লাভ করেন। তাঁকে স্বীয় পিতা হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাজারের পার্শ্বে জান্নাতুল বকীতে দাফন করা হয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক বলেন, আমার পিতা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, আমার আর পাঁচ বছর হায়াত আছে। ওফাতের পর আমি হিসাব করে দেখেছি যে, পরিপূর্ণ পাঁচ বছর পর তিনি ওফাত লাভ করেন।

উলামায়ে কিরামের অভিমত :

মহান এ সাধকের প্রশংসা করেছেন বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম নির্দ্বিধায়। এ সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করা হল।

১. ইমাম যাহাবী বলেন, 'হযরত আবু জাফর ছিলেন একাধারে ইমাম, মুজতাহিদ, কুরআন তিলাওয়াত কারী, মহান মর্যদার অধিকারী, পূর্ণ-গুণের আধার'।

২. আল্লামা ইবনে সা'দ বলেন, 'তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন'।

৩. আল্লামা আজালী বলেন, 'তিনি নির্ভর যোগ্য তাবেয়ী ছিলেন।

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, 'তিনি ছিলেন বড় মর্যদাসম্পন্ন তাবেয়ী এবং তাঁদের একজন ছিলেন , যাঁরা ইলম, আমল, নেতৃত্ব ও মর্যদার যোগ্য।

৫. ইমাম আবু হানিফা বলেন,আমি নুমান বিন সাবেরেত জীবনে যদি দু'বছর না আসত, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।আর এ দু'বছর হল হযরত ইমাম বাক্বির ও হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা এর সোহবত।

তথ্যসূত্র

১. ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুয়াসসাতুর রিসালা, ৩য় সংস্করণ-১৪০৫ হিজরী, খ: ৪র্থ, পৃ: ৪০১-৪০৯।
২. ইবনে সাদ, আত্-ত্বাবকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮ইং, খ: ৫ম, পৃ: ৩২০-৩২৭।
৩. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া, দারুল হাদীস, কায়রো, মিশর, প্রকাশকাল: ১৪২১ হিজরী, খ: ১ম, পৃ: ৩৬১-৩৬৪।
৪. ইবনে কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, নতুন সংস্করণ ১৪০৮ হিজরী, ১৯৮৮ ইং, খ ৯ম, পৃ: ৩৩৮-৩৪২।
৫. শাইখ আব্দুর রহমান চিশতী, মিরাতুল আসরার, মাকতাবাতু জামে নূর, দিল্লী, ১৪১৮ হিজরী, পৃ: ২০৮-২০৯
৬. ইবনে খল্লিকান, ওয়াফিয়াতুল আইয়ান, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৭১ইং, খ: ৪র্থ, পৃ: ১৭৫।
৭.ইমাম রাযী, আশ-শাজরাতুল মুবারাকাহ, প্রকাশনা ও তারিখ বিহীন,খ.১,পৃ.২১ ।
৮. মোসতফা রেযা খান, মলফুজাতে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁ, মুহাম্মদ আলী ইসলামী কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০১ইং, ১ম ভাগ,পৃ.১৪৩

ধারাবাহিক

নবীদের ইতিহাস

ইমাম উদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির আদ-দামেস্কী (৭০০-৭৭৪ হিজরী)

[মূল আরবী থেকে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ : রাশাদ আহমদ আজমী]

॥ ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর : ৭৮ কিস্তি)

হযরত শ্যামুয়েল আলায়হিস সালাম

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামে বলেন : (বঙ্গানুবাদ) "তুমি কি মুসার পরবর্তী নবী ইসরাঈল প্রধানদেরকে দেখনি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করতে পারি'। সে বলল, 'এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেয়া হলে তখন তোমরা আর সংগ্রাম করবে না?' তারা বলল, 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাস ভূমি ও সন্তান সন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি তখন আল্লাহ্র পথে কেন সংগ্রাম করব না? অতঃপর তাদের প্রতি যখন সংগ্রামের বিধান দেয়া হল তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ্ জালিমদের বিষয়ে সবিশেষ অবহিত"। (২ : ২৪৬)

"এবং তাদের নবী তাদের বলেছিল, 'আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের রাজা করেছেন'। তারা বলল, 'আমাদের ওপর তার কর্তৃত্ব কিভাবে হবে, যখন আমরা সে অপেক্ষা কর্তৃত্বের বেশি হকদার? এবং তাঁকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি'। নবী বলল, আল্লাহ্ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন'। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়"। (২ : ২৪৪)

"এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তাঁর কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবুত আসবে যাতে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মুসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে, ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে"। (২ : ২৪৮)

"অতঃপর তালুত যখন সেনাবাহিনীসহ বের হল, সে তখন বলল, আল্লাহ্ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা হতে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয় আর যে কেউ এর স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত, এছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও'। অতঃপর অল্প কয়জন ছাড়া তারা নদী হতে পানি পান করল। সে এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন তা অতিক্রম করল তারা তখন বলল, 'জালুত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমাদের নেই'। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্র সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। তারা বলল, আল্লাহ্র হুকুমে কত ছোট দল কত বড় দলকে পরাভূত করেছে'। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন"। (২ : ২৪৯)

"তারা যখন যুদ্ধ করার জন্য জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর'। (২ : ২৫০)

"সুতরাং তারা আল্লাহ্র হুকুমে ওদের পরাজিত করল, দাউদ জালুতকে সংহার করল, আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল"। (২ : ২৫১)

অধিকাংশ তফসীরকারদের মধ্যে উল্লিখিত আয়াত সমূহে যে নবী (আ)-এর কথা বলা হয়েছে তাঁর নাম হযরত শ্যামুয়েল আলায়হিস সালাম। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম সিমিউন। কেউ বলেছেন তাঁর নাম জসুয়া। কিন্তু এ অভিমত সত্য বলে মনে হয় না। ইবনে জরীর তাঁর ইতিহাস বইতে উল্লেখ করেছেন, হযরত জশুয়া (আ)-এর মৃত্যু ও হযরত শ্যামুয়েল (আ)-এর আবির্ভাবের সময়ের মধ্যে ব্যবধান ৪৬০ বছরের।

বনী ইসরাইলকে দীর্ঘদিন ধরে দুর্ধর্ষ শত্রুর মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। তাই তারা যুদ্ধের বিষয়ে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল। বেশ কয়েকবার তারা শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল। তারা যাযাবরের ন্যায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দাসত্ব বরণ করে নিতে হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্তায়ালা তাদের নিকট হযরত শ্যামুয়েল আলায়হিস সালামকে নবী হিসাবে পাঠান। বনী ইসরাইল তাদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করার জন্য নবীর কাছে অনুরোধ জানান। তারা বলল, তাদের জন্য যেন একজন রাজা নিযুক্ত করে দেয়া হয়। যার অধীনে থেকে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে। কিন্তু নবী হযরত শ্যামুয়েল আলায়হিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়ের দুর্বলতা ও অতীত ইতিহাসের কথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি বললেন : "আমার তো আশংকা হয়

যুদ্ধের আহ্বান এলে তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করবে"। কোরআনের ভাষায় তিনি বললেন : "এমন তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তোমরা আর যুদ্ধ করবে না?" কিন্তু তারা জবাব দিল : "কেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবো না যখন আমরা স্ব স্ব আবাসভূমি ও সন্তান সন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি?" অর্থাৎ তারা বলল, আমরা নানাভাবে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়েছি, আমরা দাসে পরিণত হয়েছি–আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। তাহলে কিভাবে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে পারি?

কিন্তু অতীতে বনি ইসরাইল কখনো তাদের অঙ্গীকার পূরণ করেনি। তারা বারবার আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। এবারো তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হলে তা পালন করা হতে তারা বিরত থাকল। কুরআন বলছে : "অতঃপর তাদের প্রতি যখন সংগ্রামের বিধান দেয়া হল তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ্ জালিমদের বিষয়ে সবিশেষ অবহিত"।

ঘটনার বিবরণীর শেষে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত অল্প কয়েকজন লোক তাদের রাজার সাথে নদী পেরিয়ে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। "এবং তাদের নবী বলেছিল, আল্লাহ্ তা'লুতকে তোমাদের রাজা করেছেন"। সালাবী বলেন : তিনি ছিলেন তা'লুত বিন কিস বিন আবিয়েল বিন জিরর বিন বিকোরেত বিন আফিহা বিন উনায়েস বিন বেনজামিন বিন ইয়াকুব। বাইবেলেও তাঁর বংশলতিকা সম্পর্কে একই বর্ণনা আছে তবে তালুতকে সেখানে বলা হয়েছে সউল। (বাইবেল শ্যামুয়েল ৯) ইকরিমা ও সুদ্দী বলেন : তিনি ছিলেন পানি বহনকারী এবং ওহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন : তিনি ছিলেন চামড়া ব্যবসায়ী।

মনে হয় তাঁর সামাজিক অবস্থান খুব ভালো ছিল না বলে বনী ইসরাঈল তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। তারা বলেছিল : "তিনি কিভাবে আমাদের রাজা মনোনীত হতে পারলেন, যখন তাঁর চেয়ে কর্তৃত্বের হকদার আমরাই বেশি এবং তাঁকে বেশি প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি?" বর্ণিত আছে যে, লেভীর বংশধরদের মধ্যে হতে নবী ও জুদাহর বংশধর হতে রাজা মনোনীত হয়েছিলেন। আর এখন তারা দেখল রাজা মনোনীত হয়ে বেনজামিনের বংশে তাই তারা তাঁকে রাজা হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তারা বলেন : "আমরাই রাজা হওয়ার তার চেয়ে বেশি উপযুক্ত"। শাসন ক্ষমতা আমাদের। তাই সেটা আমাদেরই প্রাপ্য। তবে তারা অভিযোগ করেছিল, তিনি দরিদ্র, তার তেমন কোন সম্পদ নেই, কোন প্রাচুর্যও নেই।

নবী শ্যামুয়েল আলায়হিস সালাম বললেন, কোন নির্ধারিত বংশধারা হতে রাজা মনোনীত করার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহ্ সুবহানু তায়ালাই যাকে ইচ্ছা তাকে রাজা মনোনীত করেন। "তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌ই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।" তা'লুতের মধ্যে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিল, বনী ইসরাইলের মধ্যে তার সমকক্ষ অন্য কেউ ছিল না।

"এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তাঁর কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তা'বুত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে, তার অবশিষ্টাংশ থাকবে, ফিরিশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে"।

বনী ইসরাঈল যুদ্ধে জয়লাভের প্রত্যাশায় যুদ্ধের মাঠে 'তাবুত' নিয়ে যেত। একবার ফিলিস্তিনদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শত্রুর হাতে সেই 'তাবুত' সমর্পন করে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য সান্তনা ও তালুতকে তাদের রাজা মনোনীত করার নিদর্শন স্বরূপ সেই তাবুত ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

আয়াতে বর্ণিত প্রশান্তি (সাকিনাহ) বলতে কী বুঝায়? এক বর্ণনায় আছে, একটা সোনার গামলা যাতে নবীগণ বুক ধৌত করতেন। অন্য মতে সাকিনাহ এক প্রকার বায়ু প্রবাহ। কেউ কেউ বলেন, এটা বিড়াল-আকৃতির একটা বস্তু যা যুদ্ধকালীন বেজে ওঠলে বনী ইসরাঈল বুঝতে পারত তারা যুদ্ধে জিততে যাচ্ছে।

তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই 'তাবুত' ফিরিশতারা যুদ্ধের মাঠে নিয়ে এসেছিলেন যা ইসরাইলীরা খালি চোখে দেখতে পেয়েছিল।

বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী, ফিলিস্তিনরা তাবুতটি হস্তগত করার পর এটিকে তাদের শহরে নিয়ে যায় ও দাগন নামক এক মূর্তির পাশে একে স্থাপন করে। কিন্তু পরদিন সকালে তারা দেখে মূর্তিটা 'তাবুতে'র সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ফিলিস্তিনিরা মূর্তিটাকে যথা স্থানে পুনঃস্থাপন করে কিন্তু পরদিন সকালে দেখে মূর্তিটি পূর্বদিনের মতই তাবুতের সামনে পড়ে আছে। তখন তারা বুঝতে পারল এটা ইসরাঈলীদের প্রভুরই কাজ। তাই তারা 'তাবুত' কে নিজেদের শহর থেকে অন্য শহরে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেই শহরের লোকজনের ঘাড়ে টিউমার দেখা দেয়। এতে তাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং 'তাবুত'টাকে এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা তাবুতটাকে ইসরাঈলীদের কাছে ফেরত দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর জন্য তারা একটা গাড়ী তৈরী করে ও তাতে দু'টো গরু জুড়ে দেয় যাতে তা ইসরাঈলীদের কাছে টেনে নেয়া যায়। (বাইবেল শ্যামুয়েল ৪,৫) বর্ণিত আছে যে, ফিরিশতারা একে নিয়ে এসেছিল, ইসরাঈলীরা তা দেখতে পেয়েছিল।

(চলবে)

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি তহবিল" (শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কমপ্লেক্সের একটি প্রকল্প) সম্ভাব্য কর্মসূচি

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি পরীক্ষা ২০১১-১২ ইংরেজী" (স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে = ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) *(মাইজভাণ্ডারী একাডেমী ও গাউসিয়া হক কমিটির সদস্যদের সন্তান এবং মাদ্রাসায়ে গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীতে অধ্যয়নরতদের জন্য)*

১। পরীক্ষার নিয়মকানুনসহ বৃত্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করা হবে ১১ অক্টোবর-২০১১ইং বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র ওরশ শরীফে। (গাউসিয়া হক মনজিল অফিস হতে সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হচ্ছে)।

২। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১ নভেম্বর ২০১১ইং গাউসিয়া হক মনজিলে। অথবা গাউসিয়া হকভান্ডারী খানকাহ্ শরীফ হামজার বাগ (বিবির হাট) / বাঘঘোনা দায়রা শরীফ, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

৩। পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে গাউসিয়া হক মনজিল থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০১১ ইং।
(সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক অথবা সংশ্লিষ্ট সকলকে গাউসিয়া হক মনজিল থেকে নিজ দায়িত্বে নিতে হবে)।

৪। পরীক্ষার তারিখ ও স্থান ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ ইং শুক্রবার, মাদ্রাসায়ে গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী।

৫। পরীক্ষার সময় মোট ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে ১২টা পর্যন্ত।

৬। স্কুল পর্যায়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা ঃ (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী) সাধারণ জ্ঞান ১০, বাংলা ১০, ইংরেজী ১০, গণিত ২০ (২০১১ ইং সনের সরকারী পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে)।

৭। কলেজ পর্যায়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা ঃ (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) সাধারণ জ্ঞান ১৫, বাংলা ২০, ইংরেজী ১৫ (২০১১ ইং সনের সরকারী পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে)।

৮। মাননীয় সভাপতি বরাবরে নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে লিখিত দরখাস্ত গাউসিয়া হক মনজিলে অথবা গাউসিয়া হক ভান্ডারী খানকাহ্ শরীফ হামজার বাগ (বিবির হাট) / বাঘঘোনা লালখান বাজার, চট্টগ্রামে জমা দিতে হবে। (১১-১১-২০১১ইং)

৯। দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (সভাপতি/সম্পাদক গাউসিয়া হক কমিটি, অধ্যক্ষ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত করে দরখাস্তের সাথে জমা দিতে হবে)।

১০। গাউসিয়া হক কমিটি ও মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, মাদ্রাসায়ে গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারীর অধ্যক্ষের সনদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সনদ দরখাস্তের সাথে জমা দিতে হবে।

১১। যারা ইতিপূর্বে ২ বার শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি পেয়েছে তারা আবেদন করতে পারবে না।

"শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি পরীক্ষা ২০১১-১২ ইংরেজী" (মাদ্রাসা পর্যায়ে আলিম ১ম বর্ষ ও ফাজিল ১ম বর্ষে অধ্যয়নরতদের ক্ষেত্রে)

১। পরীক্ষার নিয়মকানুনসহ বৃত্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করা হবে ১১ অক্টোবর ২০১১ইং বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র ওরশ শরীফে। (সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসা অথবা গাউসিয়া হক মনজিল অফিস হতে সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হচ্ছে)।

২। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১১ নভেম্বর ২০১১ ইং গাউসিয়া হক মনজিলে। অথবা গাউসিয়া হকভান্ডারী খানকাহ্ শরীফ হামজার বাগ (বিবির হাট), বাঘঘোনা দায়রা শরীফ, লালখান বাজার, আলোকধারা কার্যালয়, লুসাই ভবন, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

৩। পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে ১৬ ডিসেম্বর ২০১১ইং সংশ্লিষ্ট মাদ্‌রাসায় পাঠানো হবে।
(সংশ্লিষ্ট সকলকে অধ্যয়নরত মাদ্‌রাসা থেকে নিজ দায়িত্বে নিতে হবে)।

৪। পরীক্ষার তারিখ ও স্থান ঃ ৬-০১-২০১২ইং শুক্রবার, গাউসিয়া হকভান্ডারী খানকাহ্ শরীফ, হামজার বাগ (বিবির হাট), চট্টগ্রাম।

৫। পরীক্ষার সময় মোট ২ ঘন্টা। সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা।

৬। আলিম ও ফাজিল ১ম বর্ষে লিখিত পরীক্ষা মোট ৮০ নম্বর। আলিম প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত পরীক্ষার্থীদের বেলায় ২০১১ইং সনের দাখিল শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী 'কোরান মজিদ' 'হাদিস শরীফ' আরবী সাহিত্য, ফিকাহ্ ও উসুলুল ফিকাহ্ থেকে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন করা হবে। ফাজিল প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত পরীক্ষার্থীদের বেলায় ২০১১ইং সনের আলিম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী 'কোরান মজিদ' 'হাদিস শরীফ' আরবী সাহিত্য, ফিকাহ্, উসুলুল ফিকাহ্ ও ফরায়েজ থেকে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন করা হবে।

৭। একই দিন বিকাল বেলায় ২০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা একই স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

৮। মাননীয় সভাপতি বরাবরে নির্ধারিত ফরমে অথবা সাদা কাগজে লিখিত দরখাস্ত গাউসিয়া হক মনজিলে অথবা গাউসিয়া হক ভান্ডারী খানকাহ্ শরীফ হামজার বাগ (বিবির হাট), বাঘঘোনা দায়রা শরীফ, লালখান বাজার, আলোকধারা কার্যালয়, লুসাই ভবন, মোমিন রোড, চট্টগ্রামে জমা দিতে হবে।

৯। দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি (অধ্যক্ষ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত করে দরখাস্তের সাথে জমা দিতে হবে)।

১০। অধ্যয়নরত মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সনদ দরখাস্তের সাথে জমা দিতে হবে।

ফোন ৬৫৩৩৬৪, মোবাইল ০১৮১৫-৬৪৮৭৭৭

বন্দর রিপাবলিক ক্লাবে সেমিনার

'আশেকানে মাইজভাণ্ডারীর প্রতি চারিত্রিক শুচিতা অর্জনের আহ্বান'

আশেকানে মাইজভাণ্ডারীদের প্রতি চারিত্রিক শুচিতা ও নম্রতা অর্জনে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাইজভাণ্ডারী দর্শনের প্রাণপুরুষ হযরত গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী শাহ্সূফী সৈয়দ আহমদ উলাহ্ (ক) সহ এই তরিকার দিশারী মহাপুরুষরা সকলেই পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হবার জন্য তাঁদের কথায় ও কাজে তাগিদ দিয়ে গেছেন। অতএব, উন্নত চরিত্র গঠন আশেকানে মাইজভাণ্ডারীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

গত ১৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় চট্টগ্রাম বন্দর রিপাবলিক ক্লাবে "মানব চরিত্র উন্নয়নে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রদত্ত এক বাণীতে তিনি এই আহ্বান জানান।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বন্দর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম বন্দরের প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন), প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও গবেষক এ. এন. এম. এ. মোমিন। মোহাম্মদ আমান উলাহ্'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, যমুনা গ্রুপের সাবেক মার্কেটিং ম্যানেজার, বিশিষ্ট লেখক ও নিবন্ধকার মোঃ ওহীদুল আলম, ক্যাপ্টেন আমিনুল ইসলাম, হাফেজ আবুল কালাম আজাদ। মূল প্রবন্ধে কোরআন-হাদিসের আলোকে সৎ স্বভাবের নির্দেশকসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আমিরুল করিম দিলন।

অনুষ্ঠান শেষে তবরুক বিতরণ ও মাইজভাণ্ডারী মরমী গান পরিবেশিত হয়।

মাইভাণ্ডারী একাডেমীর রূহানী সংলাপ অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর রূহানী সংলাপ গত ২৯ জুন ২০১১ইং নগরীর লালখান বাজার বাঘঘোনাস্থ একাডেমীর মিলনায়তনে মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর নবনির্বাচিত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ)। নির্ধারিত বিষয় "কোরআন সুন্নাহ্র আলোকে আসহাবে রাসুল (সা)" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আলামা গোলাম মোহাম্মদ খান সিরাজী, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন একাডেমীর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সামতল আলোয়ার, এ এফ, মোহাম্মদুর রহমান, অধ্যক্ষ আলামা খায়রুল বশর হক্কানী, ওহীদুল আলম, প্রফেসর অঞ্জন কুমার চৌধুরী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ শফিউল গণি চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের শপথ পাঠ করান একাডেমীর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ)।

মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী আলিম প্রথম বর্ষের সবক অনুষ্ঠিত

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কমপ্লেক্স এর পরিচালনাধীন মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী আলিম প্রথম বর্ষের সবক (ভর্তি) প্রদান অনুষ্ঠান গত ২ জুলাই মাদ্রাসার হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কমপেক্সের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ)। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদা সৈয়দ শামসুর কবির (জাতুনিয়া) শাহজাদা সৈয়দ শামসুর আরেফীন (বাবুল মিয়া), মাওলানা খাইরুল বশর হক্কানী, জামাল আহমদ সিকদার, সৈয়দ জাহেদুল আলম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষক অভিভাবক ও স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রী আলিম ১ম বর্ষে সবক (ভর্তি) হন।

মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী আলিম প্রথম বর্ষের সবক অনুষ্ঠিত

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কমপেক্স এর পরিচালনাধীন মাদ্রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী আলিম প্রথম বর্ষের সবক (ভর্তি) প্রদান অনুষ্ঠান গত ২ জুলাই মাদ্রাসার হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কমপেক্সের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ)। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদা সৈয়দ শামসুর কবির (জাতুনিয়া) শাহজাদা সৈয়দ শামসুর আরেফীন (বাবুল মিয়া), মাওলানা খাইরুল বশর হক্কানী, জামাল আহমদ সিকদার, সৈয়দ জাহেদুল আলম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও শিক্ষক অভিভাবক ও স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি। উলেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রী আলিম ১ম বর্ষে সবক (ভর্তি) হন।

উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফস্থ গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ) প্রতিষ্ঠিত বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) কমপ্লেক্স কর্তৃক পরিচালিত উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হেফজখানার বিশেষ সাধারণ সভা গত ৯ জুলাই শনিবার বিকাল ৫টায় চট্টগ্রামস্থ বাঘঘোনা দারুর শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী।

সভায় আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে সম্মানিত সদস্যদের রশিদ বই প্রদানপূর্বক তহবিল গঠনকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতিম নির্বাসীদের মধ্যে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে পোশাক পরিচ্ছদ ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী বিতরণ এবং পবিত্র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ, ফরিদ উদ্দিন মাহমুদ, শওকত হোসাইন, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ আশরাফুজ্জামান আশরাফ, কাজী নিজামুল ইসলাম, মীর রমজান আলী, মোঃ নুর ইসলাম সওদাগর, মোগহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাফরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ মোহাম্মদ তকিরহাট শাখা

গত ২৫ জুন শনিবার রাত ৯টায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ মোহাম্মদ তকিরহাট শাখার কার্যালয়ে সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দীন এর সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক মাহফিল, মাসিক সেমা মাহফিল এবং হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ এর বার্ষিক ওরশ শরীফ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিল ও আলোচনা সভায় মোঃ জসিম উদ্দীন সভাপতি, মোঃ কামাল পাশা সাধারণ সম্পাদক, মোঃ বাদশা মিয়া সহ-সভাপতি, তাজ মোহাম্মদ সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রশান্ত রায় অর্থ সম্পাদক, মোহাম্মদ রিয়াজ সহ অর্থ সম্পাদক,

মোঃ আবদুল হালিম আপ্যায়ন সম্পাদক, নয়ন রায় সহ আপ্যায়ন সম্পাদক, খোকন রায় সহ আপ্যায়ন সম্পাদক, সহ সদস্য মোঃ হুমায়ুন, মামদ মিয়া, রতন রায়, টিপু রায়, সেলিম, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ সুমন, সত্য শীল, মোঃ রফিক, দিদার বাবুর্চি, মোঃ সাদত উল্লাহ্ প্রমুখ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। মাহফিল শেষে বিশ্বের শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় এবং পরিশেষে তবারুক বিতরণ এর মধ্য দিয়ে সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামাল পাশা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আতুরার ডিপো হাশেম বাজার শাখা

গত ১ জুলাই শুক্রবার রাত ৮টায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আতুরার ডিপো হাশেম বাজার শাখার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাসুদ আহমদের বাসভবনে সাপ্তাহিক মাহফিল অনুষ্ঠান সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়ের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বায়েজিদ খানাধীন আলী নগরে বসবাসরত মুহাম্মদ মাহফুজের ১ম কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য অনুলানের টাকা তুলে সেন সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মাসুদ আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী এরশাদুল আলম সিকদার, শওকত হোসেন রুবেল, অপু সরওয়ার, বেলাল হোসাইন, শাহাজাহান, রানা এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ। মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনায় ছিলেন মুহাম্মদ শহীদুল আলম।

ফটিকছড়ি সদর পৌরসভা উত্তর ধুরুং মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির উদ্যোগে অগ্নিদূর্গতদের অনুদান প্রদান

গত ১২ জুন রোববার মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি সদর পৌরসভার উত্তর ধুরুং দায়রা শরীফ শাখার উদ্যোগে উত্তর ধুরুং কুলাল পাড়ায় অগ্নিদূর্গতদের অনুদান হিসেবে নগদ ৫ হাজার টাকা ঘর নির্মাণ কমিটির কাছে প্রদান করা হয়। এতে কমিটির পক্ষে অনুদান প্রদান করেন সংগঠক মোঃ জালাল উদ্দীন চৌধুরী। এতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ মাহমুদুল হক, হক কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ শাহাবুদ্দীন, কমিটির পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ মফিজুল হক, মোঃ টিপু, মোঃ জানে আলম প্রমুখ।

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আতুরার ডিপো হাশেম বাজার শাখা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১ জুলাই শুক্রবার রাত ৮টায় মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ আতুরার ডিপো হাশেম বাজার শাখার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাসুদ আহমদের বাসভবনে সাপ্তাহিক মাহফিল অনুষ্ঠান সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অসহায় পরিবারের মেয়ের বিয়ের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বায়েজিদ খানাধীন আলী নগরে বসবাসরত মুহাম্মদ মাহফুজের ১ম কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্য অনুলানের টাকা তুলে সেন সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ ওমর ফারুক ও মাসুদ আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী এরশাদুল আলম সিকদার, শওকত হোসেন রুবেল, অপু সরওয়ার, বেলাল হোসাইন, শাহাজাহান, রানা এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ। মিলাদ ও মুনাজাত পরিচালনায় ছিলেন মুহাম্মদ শহীদুল আলম।

ফটিকছড়ি সদর পৌরসভা উত্তর ধুরুং মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির উদ্যোগে অগ্নিদূর্গতদের অনুদান প্রদান

গত ১২ জুন রোববার মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি সদর পৌরসভার উত্তর ধুরুং দায়রা শরীফ শাখার উদ্যোগে উত্তর ধুরুং কুলাল পাড়ায় অগ্নিদূর্গত পরিবারের মাঝে অনুদান হিসেবে নগদ ৫ হাজার টাকা ঘর নির্মাণ কাজে প্রদান করা হয়। এতে কমিটির পক্ষে অনুদান প্রদান করেন সংগঠক মোঃ জালাল উদ্দীন চৌধুরী। এতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ মাহমুদুল হক, হক কমিটির সহ-সভাপতি মোঃ শাহাবুদ্দীন, কমিটির পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ মফিজুল হক, মোঃ টিপু, মোঃ জানে আলম প্রমুখ।

মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়া হক কমিটি শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত

গত ১৮ জুলাই সোমবার মাইজভাণ্ডারী গাউছিয়া হক কমিটি সূর্যগিরি আশ্রম শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ব অলি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক)-এর রওজা শরীফের খাদেম মাওলানা হাফেজ আবুল কালাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মাইজভাণ্ডারী একাডেমীর সদস্য শাহেদ আলী চৌধুরী। ভাঃ বরুন কুমার আচার্য্য (বলাই) বৌদ্ধভাবে একটি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে দুইশত জনকে ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির উপদেষ্টা পাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার গৌতম সেবক বড়ুয়া, সহ-সভাপতি টিটু চৌধুরী, তরুন কুমার আচার্য্য (কৃষ্ণ), সাধারণ সম্পাদক ধীমান দাশ, মৌলানা আনোয়ারুল হক, বিপব চৌধুরী (কাঞ্চন), মাইকেল দে, ছোটন ধর, মানিক বড়ুয়া, প্রিন্স দাশ, বাবন চৌধুরী, মৃদুল দে, অনুপম তালুকদার, রুবেল শীল, কৃষ্ণ বৈদ্য, লালু চক্রবর্ত্তী, সুপব দত্ত, ঝুটু শীল, সুমন, অর্চ্চনা রাণী আচার্য্য, রুপনা আচার্য্য, শশী মহাজন, আলো বড়ুয়া, মিতা বড়ুয়া, টিংকু বড়ুয়া, উজালা বড়ুয়া, বিপব বড়ুয়া প্রমুখ।

মোঃ আরফান উলাহ'র ইন্তিকাল

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ছোট হরিণা শাখার উপদেষ্টা মোহাম্মদ আরফান উল্লাহ্ সওদাগর গত ২৬ জুন সকাল ৭টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে---রাজেউন)। তাঁর মৃত্যুতে কমিটির পক্ষ হতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রূহের মাগফিরাত ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

আহমদ ছফা ফকিরের ইন্তিকাল

গত ১৭ জুলাই রোববার সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি কাঞ্চনপুর শাখার সভাপতি ও শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর আশেক মোঃ আব্দুর রহিম প্রকাশ আহমদ ছফা ফকির ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে---রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে, ৪ মেয়ে, আত্মীয়-স্বজনসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। তার মৃত্যুতে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক মনজিলের সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম জি আ), মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদ ও বিভিন্ন শাখার পক্ষ হতে গভীর শোক প্রকাশ ও তার রুহের মাগফেরাত কামনাসহ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

স্থাপত্য প্রকল্প :

১. শাপলা নক্শা শোভিত রওজা শরীফ
২. বাব-এ-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী তোরণ (নাজিরহাট দরবার গেইট)

শিক্ষা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প :

১. মাদ্‌রাসা-এ-গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী
২. উম্মুল আশেকীন মুনাওয়ারা বেগম হেফজখানা ও এতিমখানা
৩. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক) বৃত্তি তহবিল
৪. মাইজভাণ্ডার শরীফ গণপাঠাগার
৫. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি
৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি
৭. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া
৮. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী এবতেদায়ী কে. জি. মাদ্‌রাসা, পশ্চিম গোমদণ্ডী, বোয়ালখালী
৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী
১০. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী
১১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরীফ ফোরকানীয়া মাদ্‌রাসা, চন্দনাইশ (সদর)
১২. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী স্কুল, শান্তির দ্বীপ গহিরা, রাউজান
১৩. মাদ্‌রাসা-এ-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী এবতেদায়ী ও হেফজখানা, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম।

দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প :

১. হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরীফ)

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প :

১. মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি (রেজিঃ নং-চট্টগ্রাম ২৪৬৮/০২)
২. প্রত্যাশা সঞ্চয় প্রকল্প
৩. যাকাত তহবিল
৪. দুস্থ সাহায্য তহবিল

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প :

১. মাসিক আলোকধারা
২. মাইজভাণ্ডারী একাডেমী

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প :

১. মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
২. মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন

জনসেবা প্রকল্প :

১. নাজিরহাট ভেমোহনী রাস্তার মাথায় যাত্রী ছাউনী ও এবাদতখানা
২. শানে আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন যাত্রী ছাউনী
৩. ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরীফ)

THE MONTHLY ALOKDHARA REGD. NO CHA - 272 PRICE - 15.00

রোযার গুরুত্ব ও ফাযায়েল - হে ঈমানগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার। *(আল - কুরআন)*
রসুল (সা) ইরশাদ করেন, রমযান এমন একটি মাস; যার প্রথমাংশে আল্লাহ্ পাকের রহমত, মধ্যমাংশে মাগফিরাত ও শেষাংশে দোযখ থেকে পরিত্রাণের ফয়সালা অবতীর্ণ হয়। *(আল - হাদিস)*

নিয়ত - নাওয়াইতুআন আছুমা গাদাম মিন শাহরে রমজানুল মোবারক ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহ্ ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ ছামিউল আলিম।

দোয়া - আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়াবেরিজক্বিকা আফ্তারতু আল্লাহুম্মাগফিরলী ক্বাদ্দমতু ওয়ামা আখ্যারতু।

রমযান বার্তা ১৪৩২ হিজরী / সাহ্রী ও ইফতারের সময়সূচী

রমযান মাস	ইংরেজী মাস	বার	সাহ্রীর সময়	ফজরের আযান	ইফতার
রহমত					
০১	০১ আগষ্ট	সোমবার	৩.৫৫	৪.০১	৬.৩৬
০২	০২ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৩.৫৬	৪.০১	৬.৩৬
০৩	০৩ আগষ্ট	বুধবার	৩.৫৭	৪.০১	৬.৩৫
০৪	০৪ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৩.৫৮	৪.০২	৬.৩৫
০৫	০৫ আগষ্ট	শুক্রবার	৩.৫৮	৪.০২	৬.৩৪
০৬	০৬ আগষ্ট	শনিবার	৩.৫৯	৪.০৩	৬.৩৪
০৭	০৭ আগষ্ট	রবিবার	৪.০০	৪.০৩	৬.৩৩
০৮	০৮ আগষ্ট	সোমবার	৪.০১	৪.০৪	৬.৩২
০৯	০৯ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৪.০২	৪.০৪	৬.৩২
১০	১০ আগষ্ট	বুধবার	৪.০২	৪.০৪	৬.৩১
মাগফিরাত					
১১	১১ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৪.০২	৪.০৫	৬.৩১
১২	১২ আগষ্ট	শুক্রবার	৪.০৩	৪.০৫	৬.৩১
১৩	১৩ আগষ্ট	শনিবার	৪.০৪	৪.০৫	৬.২৯
১৪	১৪ আগষ্ট	রবিবার	৪.০৪	৪.০৬	৬.২৯
১৫	১৫ আগষ্ট	সোমবার	৪.০৫	৪.০৬	৬.২৮
১৬	১৬ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৪.০৫	৪.০৭	৬.২৮
১৭	১৭ আগষ্ট	বুধবার	৪.০৫	৪.০৭	৬.২৭
১৮	১৮ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৪.০৬	৪.০৭	৬.২৬
১৯	১৯ আগষ্ট	শুক্রবার	৪.০৭	৪.০৭	৬.২৫
২০	২০ আগষ্ট	শনিবার	৪.০৭	৪.০৮	৬.২৪
নাজাত					
২১	২১ আগষ্ট	রবিবার	৪.০৭	৪.০৯	৬.২৩
২২	২২ আগষ্ট	সোমবার	৪.০৮	৪.১০	৬.২২
২৩	২৩ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৪.০৮	৪.১০	৬.২১
২৪	২৪ আগষ্ট	বুধবার	৪.০৯	৪.১১	৬.২১
২৫	২৫ আগষ্ট	বৃহস্পতিবার	৪.১০	৪.১২	৬.২০
২৬	২৬ আগষ্ট	শুক্রবার	৪.১১	৪.১৩	৬.১৯
২৭	২৭ আগষ্ট	শনিবার	৪.১২	৪.১৪	৬.১৮
২৮	২৮ আগষ্ট	রবিবার	৪.১২	৪.১৫	৬.১৭
২৯	২৯ আগষ্ট	সোমবার	৪.১২	৪.১৬	৬.১৬
৩০	৩০ আগষ্ট	মঙ্গলবার	৪.১৩	৪.১৭	৬.১৫